BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

হুমায়ুন আজাদ

আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম

১৯৭১ ছিলো ১৯৪৭-এর সংশোধন; আমরা ওই বছর মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম, একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আমাদের অজস্র স্বপ্ন ছিলো– গণতন্ত্রের, সমাজতন্ত্রের, ধর্মনিরপেক্ষতার, বাঙালিত্বের, এবং সা[illegible] মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার। আমরা [illegible] স্বপ্নকেই সফল করতে পারি নি। হত্যা [illegible] হয়েছে বাঙলাদেশের স্থপতিকে, [illegible] বন্যা বয়ে গেছে; সামরিক স্বৈরাচারীরা এসে [illegible] পর্যুদস্ত করেছে। বর্তমানে বাঙলাদেশ বাস করছে ভয়ের মেঘমালার নিচে। হুমায়ুন আজাদ একান্ত ব্যক্তিগত ভঙ্গি ও ভাষায় বর্ণনা করেছেন বাঙলাদেশের বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত, লিখেছেন একটি বেদনাহত বই। এ-বই বাঙলাদেশের দেহ ও হৃদয়ের অপার বেদনার প্রকাশ;– হাহাকার নয়, নিঃশব্দ রোদন।

হুমায়ুন আজাদ

আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম

আগামী প্রকাশনী

ষষ্ঠ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪০৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
চতুর্থ মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ মে ২০০৪
পঞ্চম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

স্বত্ব : হুমায়ুন আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ বাংলাদেশ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১
প্রচ্ছদ সমর মজুমদার
মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ৬ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

ISBN 984 401 736 X

Amra Ki Ei Bangladesh Cheyechilam :
Did We Want This Bangladesh ::
An Essay by Humayun Azad
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Sixth Printing : February 2006

Price : Tk. 100.00

উৎসর্গ

যখন আমরা বসি মুখোমুখি, আমাদের দশটি আঙুল হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপতে থাকে
দশটি আঙুলে, আমাদের ঠোঁটের গোলাপ ভিজে ওঠে আরক্ত শিশিরে,
যখন আমরা আশ্চর্য আগুনে জ্বলি, যখন আমরাই আমাদের স্বাধীন স্বদেশ,
তখন ভুলেও কখনো আমাকে তুমি বাঙলাদেশের কথা জিজ্ঞেস কোরো না;
আমি তা মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না,- তার অনেক কারণ রয়েছে।

তোমাকে মিনতি করি কখনো আমাকে তুমি বাঙলাদেশের কথা তুলে কষ্ট দিয়ো না।
জানতে চেয়ো না তুমি নষ্টভ্রষ্ট ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের কথা; তার রাজনীতি,
অর্থনীতি, ধর্ম, পাপ, মিথ্যাচার, পালে পালে মনুষ্যমণ্ডলি, জীবনযাপন, হত্যা, ধর্ষণ,
মধ্যযুগের দিকে অন্ধের মতোন যাত্রা সম্পর্কে প্রশ্ন ক'রে আমাকে পীড়ন কোরো না;
আমি তা মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না,- তার অনেক কারণ রয়েছে।

তার ধানখেত এখনো সবুজ, নারীরা এখনো রমণীয়, গাভীরা এখনো দুগ্ধবতী,
কিন্তু প্রিয়তমা, বাঙলাদেশের কথা তুমি কখনো আমার কাছে জানতে চেয়ো না;
আমি তা মুহূর্তও সহ্য করতে পারি না,- তার অনেক কারণ রয়েছে।

এ-বইটি হয়তো আমি কখনোই লিখতাম না।

এটি লেখার কথা আমার মনে আসতো না, যদি না আমি এখন এ-পরিস্থিতিতে– উদ্ধারহীন, শ্বাসরুদ্ধকর, বদ্ধ অন্ধকারে বাস করতাম। নিজের দেশে এমনভাবে বাস করছি যেনো দণ্ডিত হয়ে আছি। হয়তো অন্য কিছু লিখতাম, উপন্যাস বা প্রেমের কবিতা বা প্রবন্ধ, বা অন্য কিছু, বা কিছুই লিখতাম না, এটি লেখার কথা আমার মনে আসতো না।

কখনোই অবশ্য ভালো ছিলাম না। যে-মুক্ত, স্বাধীন, সৎ, ব্যক্তির পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক দেশে বাসের স্বপ্ন দেখেছি, তা কখনো পূরণ হয় নি; দশকের পর দশক দুঃসহ অবস্থায় বাস ক'রে ক'রে এখন দুঃসহতম অবস্থায় পৌঁছে গেছি। বাস করছি ভয়ের জলবায়ুতে। এখানে শান্তিতে বাস করা যায় না; স্বস্তিতে কোনো সৃষ্টিশীল কাজ করা যায় না।

রাষ্ট্র আমাদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করেই নি, এমন কি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে নি; বরং রাষ্ট্রই হয়ে উঠেছে হিংস্র; আমাদের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার আতঙ্ক। রাষ্ট্র দ্বারা আমাদের দেহ বিকল, মনও আক্রান্ত, মগজ বিনষ্ট। দেহ-মন-মগজে আক্রান্ত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাস করা মৃত্যুর থেকেও পীড়াদায়ক।

প্রতিহিংসা ও পীড়ন হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রনীতি।

প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি যাকে ইচ্ছে তাকে ধ'রে নেয়া হচ্ছে।

তাঁদের অনেকে শাসকমণ্ডলির অধিকাংশের থেকে সম্মানিত, দেশের জন্যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়,– তাঁদের পীড়ন ক'রে থেৎলে দেয়া হচ্ছে, ভেঙে দেয়া হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি সাড়াশি দিয়ে তাঁদের চামড়া তুলে ফেলা হচ্ছে, অন্তত একটি তরুণীকে বিদ্যুতের ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে গোপনাঙ্গে, মনে পড়ে পাকিস্তানপর্বে ইলামিত্রের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো গরম ডিম; ঘ'টে চলছে রিম্যান্ডের পর রিম্যান্ড– পুলিশের গুঁতোর পর গুঁতো, ডিটেনশন ও ডিটেনশন– আটকের পর আটক, দেশটি হয়ে উঠেছে ডিটেনশনশালা, গুঁতোখানা, আটকখানা, হাজতখানা, পেষণশালা। এতো অত্যাচার, দৈহিক ও মানসিক, অনেক দিন দেখি নি, যদিও আমাদের জীবনের সবটাই কেটেছে নানা অত্যাচারের মধ্যে।

আমরা তো প্রকৃত স্বাধীনতা ও অধিকার কখনো দেখি নি।

ক্ষুদ্র দেশে আমরা ক্ষুদ্রদের অধীনে ক্ষুদ্র মানুষ হয়ে আছি, স্বাধীনতা ও অধিকারের মতো বিরাটকে আমরা কী ক'রে দেখবো?

প্রতিদিনই দেখছি উচ্চবিচারালয়ের আদেশকেও অবহেলা করা হচ্ছে।

সেখান থেকে মুক্তির অধিকার পেয়ে কারাগারের দরোজায় এসে লোকজন দেখতে পাচ্ছে তাদের জন্যে আরেকটি বেড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে। কোনো সামরিক শাসনের সময়ও এতোটা অত্যাচার ঘটে নি, এতো ভয় সৃষ্টি করা হয় নি; সশস্ত্রবাহিনীকে এতো নির্মমভাবে ব্যবহার করা হয় নি। সরকার মানছে না সভ্যতার, গণতন্ত্রের, মানবিকতার, মানুষের মৌলিক অধিকারের কোনো রীতি; সন্ত্রাস নির্মূলের নামে তারা সশস্ত্রদের দিয়ে রোমহর্ষক সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।

খুলে দেয়া হয়েছে 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' নামক একটি নৃশংস প্রক্রিয়ার দরোজা– দেশটি পরিণত হয়েছে আফ্রিকার জঙ্গলে।

সামরিক এ-ধরনের নামগুলোর মধ্যেই থাকে প্রচণ্ড হিংস্রতার ইঙ্গিত। বড়ো আকারে, বিশ্বপর্যায়ে, যা নাম পায় 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' বা 'ইনফিনিট জাস্টিস', ছোটো আকারে তা হয়ে ওঠে 'অপারেশন ক্লিন হার্ট'। বাঙলাদেশে এটি যে-ভীতি জাগিয়েছে, হিংস্রতা দেখিয়েছে, যেভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ক'রে ফেলেছে প্রায় ৫৮ জনের– হয়তো আরো বেশির, বিকলাঙ্গ করেছে হাজার হাজার মানুষকে, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু নির্মম হিংস্র একনায়কপীড়িত দেশে।

এখানে সুপরিকল্পিতভাবে মুক্তচিন্তা, প্রগতিশীলতা, যুক্তিশীলতা ও বাকস্বাধীনতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে যে কেউ আর মুক্তচিন্তার সাহস কোরো না।

বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছে বন্দীশিবির, বা গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ।

কলকারখানা বন্ধ ক'রে সরকার খুলে বসেছে 'কারাগার ইন্ডাস্ট্রি'; দেশে আর কোনো উৎপাদন নেই শুধু ত্রাস আর গ্রেফতার উৎপাদন ছাড়া। দেশ হয়ে উঠেছে অত্যাচারের স্বয়ংক্রিয় কারখানা। প্রতিহিংসার দানবকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে দেশ জুড়ে। আরো ভয়াবহ হচ্ছে যে তরুণদের বিকৃত ক'রে ফেলা হচ্ছে; তারাও মুক্তচিন্তার প্রতি আগ্রহ বোধ করছে না; তারা অন্ধের মতো শ্লোগান দিচ্ছে নিজেদেরই ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে– নষ্টভ্রষ্ট নেতাদের নামে শ্লোগান দিয়ে, বইপুস্তক খাতাপত্র নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে, তারা নেতা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

একদিন তারা মন্ত্রী হবে, তাই এখনই তাদের সন্ত্রাস করার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময়; তাদের হওয়া দরকার সন্ত্রাসের ডক্টরেট, ডক্টর সন্ত্রাস। পিতামাতারা নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তারা নষ্ট ক'রে চলছে সন্তানদের ভবিষ্যৎ, দেশের ভবিষ্যৎ।

স্বাধীন বাঙলাদেশ ক্রমশ হয়ে উঠেছে একটি নির্মম হাজত।

এ-অবস্থায় আমি কী ক'রে বটছায়াতলে ব'সে ধ্যান করি?

শুধু হাহাকার জাগে : আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

এই কি আমাদের স্বপ্নের বাঙলাদেশ, সোনার বাঙলা?

এই মানবাধিকারহীন বন্দীশিবির? এই কুষ্ঠাগার? এই ভাগাড়? এই নরক? এই ডাকাতপল্লী? এই দূষিত ডোবা? এই দুর্বৃত্তকবলিত চর? এই পঙ্গু হাসপাতাল? এই নর্দমা চেয়েছিলাম আমরা?

মুক্তচিন্তা, বাকস্বাধীনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবাধিকারই হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের কাছে সবচেয়ে আপত্তিকর; শিল্পকলা তো এখন ময়লায় পরিণত হয়েছে। এটি লেখার কথা এই সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক স্থবিরতা, ভয়াবহতা ও নৃশংসতার মধ্যে কেনো হঠাৎ মনে এলো? কোন অন্ধকার, কোন যন্ত্রণা এটি আমাকে উপহার দিলো?

এতো বদ্ধ অবস্থায়, এমন কারাগারে, এমন বন্দীশিবিরে আমি আগে কখনো বাস করি নি– একাত্তরেও নয়, সেটি ছিলো মুক্তির বছর, বিদেশি খুনিদের দিয়ে আক্রান্ত থেকেও আমরা মুক্ত ছিলাম। এভাবে আমার দম আগে কখনো বন্ধ হয়ে আসে নি। এটি কি পারিপার্শ্বিক গভীর হতাশা থেকে নিজেকে উদ্ধারের একটি নিষ্ফল বিপজ্জনক উদ্যোগ?

সুড়ঙ্গের পরপারে এখানে কোনো আশার আলো দেখি না।

বেশ কিছু দিন ধ'রে কিছু করতে পারছি না, লিখতে পারছি না, পড়তে পারছি না, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, কারো মুখ দেখে সুখী হই না, পত্রিকার পাতা খুললে ভোরবেলাটি তীব্র ঘৃণার বমিতে অসুস্থ ক্লেদাক্ত ওঠে, কোনো উৎসাহ পাই না, যদিও সমস্ত নিরর্থকতার মধ্যে লেখাপড়ার মতো তুচ্ছ আগ্রহটি আমার মধ্যে রক্তধারার মতোই বয়ে চলে, এখন এমন হচ্ছে কেনো? কেনো এতো স্থবিরতা বোধ করছি? এমন অসুস্থতা? এমন শ্বাসরুদ্ধকরতা? ক্লস্ট্রফোবিয়া? এমন পীড়ন, এতো নিরাশা? কেনো মনে হচ্ছে নাটসি জার্মানিতে ইহুদির মতো আছি? আমরা প্রতিমুহূর্তে ভয়ের মধ্যে আছি; ভয়ই এখন আমাদের প্রভু।

দিগন্ত কারাগারের দেয়ালের মতো চেপে আসছে, মুক্ত বায়ু বইছে না, চারদিকে কারাগারের শিক ও দেয়াল দেখতে পাচ্ছি, দিকে দিকে শুধু ডাণ্ডাবেড়ি উৎপাদিত হচ্ছে। এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম আমরা? এভাবে ভীতির মধ্যে বাস করার জন্যে– বড়ো-ছোটো স্বৈরাচারীদের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্যে? অনেকের সঙ্গে কখনো কখনো কথা ব'লে দেখেছি, তাঁরাও আমার মতোই হতাশার গর্তে বাস করছেন, কোনো উৎসাহ পাচ্ছেন না, ভারি স্থবিরতার নিচে ডুবে যাচ্ছেন, নিশ্বাস নিতে পারছেন না। কী হয়েছে আমার, এবং অনেকের? ইয়েট্সের 'দ্বিতীয় আগমন'-এর কালের শোচনীয়

পরিস্থিতিতে আছি ব'লে মনে হয়– 'চারদিকে আপ্লাবিত নিষ্পাপ উৎসব; শ্রেষ্ঠরা সমস্ত বিশ্বাসরিক্ত, যখন নষ্টরা পরিপূর্ণ সংরক্ত উৎসাহে।'

দেশের ভাবমূর্তির কথা এখন খুব শুনতে পাই।

ভাবমূর্তি শব্দটি সম্ভবত শাসকেরা নতুন শিখেছে; শিশুরা নতুন কোনো ছড়া শিখলে যেমন আনন্দে যখন তখন আবৃত্তি করে, তারাও তেমনি আবৃত্তি ক'রে চলছে। আমাদের রাজনীতিবিদেরা, আমলারা, ব্যবসায়ীরা, সেনাপতিরা, শিল্পপতিরা, সবাই কমবেশি দুর্বৃত্ত, অসৎ, স্বার্থপর, অযোগ্য; তাদের ভাবমূর্তি তো দুর্বৃত্তের। তারাই তো সৃষ্টি ক'রে চলছে দেশ, ও দেশের ভাবমূর্তি, ওই মূর্তির রূপ তো তাদের মতোই হবে।

আমার দেশের ভাবমূর্তি আবার কী বিশ্বে?

এর ভাবমূর্তি দুঃশাসনের, দারিদ্র্যের, দুর্ভিক্ষের, হত্যাকাণ্ডের, দুর্নীতিতে প্রথম হওয়ার, বন্যায় ভেসে যাওয়ার, ঝড়ে ভেঙে পড়ার, ভিখিরির, এখন অনেকটা তালেবানের। ধার্মিকেরা বোমা ফাটাচ্ছে দিকে দিকে; তারা অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে। আমি কি আমার দেশ সম্পর্কে অকপটে কথা বলতে পারবো না? এমনকি বিদেশে গিয়েও? দেশে তো বলাই যায় না, বিদেশে গিয়েও বলা যাবে না? তারপরও দেশের ভাবমূর্তি উদ্ভাসিত থাকবে স্বর্গীয় আলোতে? মার্কিনরা তো প্রকাশ্যেই তাদের রাষ্ট্রপতিকে বলে 'খুনি', আমরা কি তা বলতে পারি? আমরা তো সব সময়ই অধিকারহীনতা ও ভয়ের মধ্যে আছি।

যে-দেশে বাকস্বাধীনতা নেই, চিন্তার স্বাধীনতা নেই, অধিকার নেই, যেখানে কয়েকটি দুর্বৃত্ত সর্বশক্তিমান, সেখানে উৎকৃষ্ট প্রতিভা জন্ম নেয়া দূরের কথা, একটি ভালো চর্মকারও জন্ম নিতে পারে না।

নিকৃষ্টদের অধীনে সব কিছুই নিকৃষ্ট হয়ে যায়।

দশকে দশকে নিকৃষ্টদের– অতিশয় নিকৃষ্টদের, পামরদের– অধীনে থেকে থেকে দিন দিন নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছি। প্রায় সবাই কি পারিপার্শ্বিক হতাশায় ডুবে গেছে? সকলে নয়; অনেকে এখন প্রচণ্ড উদ্দীপনা উল্লাস দম্ভের মধ্যে আছেন, তাঁদের উদ্দীপনা উল্লাস দম্ভের শেষ নেই, তা তো অসহায় বৃদ্ধের মতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু ওই প্রচণ্ড উদ্দীপনা উল্লাস গর্জন আমার, ও আরো অনেকের, ভেতরে ঢুকছে না কেনো, আমি কেনো সংরক্ত হচ্ছি না ওই উদ্দীপ্ত গর্জিত অনেকের মতো? বরং সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে কেনো? ওই উল্লাসকে কেনো মনে হয় হাহাকার, বোবা বাঙলাদেশের হাহাকার, বর্বরতার হুংকার, মধ্যযুগের গর্জন? কেনো আজ মনে হয় যদি জন্ম না নিতাম এই দেশে, চোখ না মেলতাম এই ম্লান আলোতে, নিশ্বাস না নিতাম এই বাতাসে?'

ভালো হতো? তাহলে খুব ভালো হতো? হয়তো খুব ভালো হতো। এই

অন্ধকারে আমাকে পড়তে হতো না? খুব ভালো হতো তাহলে? বাঙলাদেশে জন্ম নেয়া কি অভিশাপ আমার, ও আরো অনেকের, জন্যে?

কিন্তু আমি কি আমার জন্ম বাতিল করতে পারি; আমি কি দূরে যেতে পারি, যতো দূরেই যাই, যেখানে জন্মেছিলাম, যে আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলো, যাকে আমি স্বপ্নে ভ'রে তুলেছিলাম, তার থেকে? যতো তুচ্ছই হোক বিশ্বে, সে তো আমার কাছে ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সে আমাকে আজ অসুস্থ করছে। সে নিজেই অসুস্থ।

আমি তো একে নিয়ে সুখী ও সৃষ্টিশীল থাকতে চেয়েছি, কোনো উজ্জ্বল ভূভাগের ইশারায় আলোড়িত হই নি, নিজের দেশকেই উজ্জ্বল, মুক্ত, সচ্ছল, ভবিষ্যৎমুখি দেখতে চেয়েছি, সৎ দেখতে চেয়েছি, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানমনস্ক দেখতে চেয়েছি, গণতান্ত্রিক দেখতে চেয়েছি, আলোকিত করতে চেয়েছি; কিন্তু বছরে বছরে আমার দেশ অন্ধকার থেকে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, মধ্যযুগের গভীর প্রসারিত তমসা আমার দেশকে ঘিরে ধরছে। কোথাও আলো দেখছি না, শুধুই অন্ধকার, মানবাধিকারহীনতা, পীড়ন, দারিদ্র্য, এবং বর্বরতা, ও বর্বরতার নিরঙ্কুশ উল্লাস।

আমার দেশ আমার, আমাদের, সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে; রাষ্ট্রচালকেরা আমার দেশকে বিশ্বাসঘাতক ক'রে তুলেছে। অথচ কতো প্রত্যাশা ছিলো দেশের কাছে আমাদের।

এখনো কিছু বিষয় আমার প্রিয়– আমি এখনো পুরোপুরি বিমানবিক হয়ে যাই নি, সেগুলো সম্পর্কে কখনো কখনো কথা বলতে, শুনতে আমার ভালো লাগে, শুনে বেঁচে থাকি, কিন্তু একটি বিষয় সম্পর্কে শুনতে ও বলতে আমার আর ভালো লাগে না, অসুস্থ বোধ করি, সহ্য করতে পারি না, আমার সারা দেহমন জ্বালা করে, বমি আসে, ঘৃণা লাগে।

বিষয়টি কী? বিষয়টি : বাঙলাদেশ।

আগে এমন হতো না, এটা অতি প্রিয় বিষয় ছিলো আমারও, অনেকের মতো; কিন্তু আজকাল কেউ এ-বিষয়ে কথা বলতে এলে বলি : বাঙলাদেশ সম্পর্কে কোনো কথা নয়, এ-সম্মর্কে কোনো কথা শুনতে ও বলতে চাই না; বাঙলাদেশ কথা বলার মতো বিষয় নয়, অন্য কোনো কথা বলো।

আমি কি খুব দুঃখে আছি, কষ্টে আছি, ঘৃণায় আছি; ঘৃণার মধ্যে বেঁচে আছি, এবং ঘৃণার মধ্যে থেকে থেকে ম'রে যাবো?

আমি কি ভালোবাসতে জানি না? আমার কি হৃদয় ব'লে কিছু নেই? আমি কি ভোরবেলায় পাখির ডাকে জেগে উঠে, রোদ দেখে, কুয়াশা দেখে, ঘাস দেখে, কারো মুখ দেখে, হঠাৎ কারো কণ্ঠস্বর শুনে সুখ পাই না? আমি কি ভালোবাসি না দুঃখী এই দেশকে? এ-দেশ কি আমার রক্তের সঙ্গে জড়ানো নয়? আমি কি এই দেশকে আমার জন্যে অপরিহার্য ক'রে তুলি

নি, আমি কি এমন কাজ করি নি যাতে এদেশই আমার নিয়তি হয়?

আমি কি উদ্বাস্তু হয়ে পরবাসে গিয়ে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে ফিরতে চাই? এখন মাঝেমাঝে তাই মনে হয়, ইচ্ছে হয় নির্বাসিত হই, এমন কোনো দেশে গিয়ে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে ফিরি, উচ্ছিষ্ট খেয়ে বাঁচি, পথের পাশে প'ড়ে থাকি, যাতে আমার কখনো মনে না পড়ে যে আমার একটি স্বদেশ ছিলো, যার নাম বাঙলাদেশ, যাকে আমি ভালোবাসতাম, যাকে বিশ্বাসঘাতকেরা বলাৎকার ক'রে ক'রে ভেঙেচুরে ফেলেছে।

ধর্ষণ এখন বাঙলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে, বাঙলাদেশ এখন ধর্ষণের প্রেক্ষাগার, ৫৬,০০০ বর্গমাইলব্যাপী বলাৎকারের রঙ্গমঞ্চ; পথে পথে ঘরে বাইরে ধর্ষিত হচ্ছে নারীরা, ২০০১-এর নির্বাচনের পর হিন্দু তরুণীদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে ধর্ষণের ঝড়, কিন্তু যে সবচেয়ে ধর্ষিত পীড়িত লাঞ্ছিত বলাৎকৃত সম্ভ্রমলুণ্ঠিত, তার নাম বাঙলাদেশ, আমার জন্মভূমি– বেদনাপীড়িত সোনার বাঙলা।

আমরা বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন চারপাশে যে-বাঙলাদেশ দেখি, তাকে বাঙলাদেশ মনে হয় না, একে আমরা চাই নি, এভাবে চাই নি; একে মনে হয় এক বিকৃত নষ্ট বসবাসঅযোগ্য জনপদ, যাকে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়েছে, যে তার কোনো প্রতিশ্রুতি পালন করে নি, যা তার জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করা হয়েছে। তাকে অসৎ ক'রে ফেলা হয়েছে। বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছে এক ভীতিকর জঙ্গল, নেকড়েরা যে-কোনো সময় লাফিয়ে পড়তে পারে।

আমার প্রিয় শিক্ষক– মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কথা আমার এ-মুহূর্তে মনে পড়ছে; আলবদরদের হাতে তিনি নিহত হয়েছিলেন, তাঁর কথা এখন বেশি কেউ বলে না। তিনি শহিদ? 'শহিদ' শব্দটি আমার ভালো লাগে না; শব্দটির অর্থ 'সাক্ষী'; তিনি কার কাছে সাক্ষ্য দেবেন? তিনি কোনো দলে ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিলো না, তাই তাঁকে আমরা ভুলে গেছি।

তিনিই *পূর্বদেশ*-এ প্রকাশিত (১৯৬৯ বা ১৯৭০-এ) একটি লেখায় প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন 'বাঙলাদেশ' নাম। তাঁর নাম রাখা দেশে এখন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বেঁচে থাকলে তিনিও নিশ্বাস নিতে পারতেন না, চোখ মেলে তাকাতে কষ্ট হয়, বেঁচে থাকলে তিনিও চোখ মেলে তাকাতে পারতেন না। সকাল থেকে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত এখানে নিরন্তর গর্বিত মিথ্যাচার ও আরো মিথ্যাচারের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়; রাষ্ট্র অবিরল শেখায় যে মিথ্যাচারই সত্যাচার, দুর্নীতিই সুনীতি, অত্যাচারই জনগণকে সুখী করার পদ্ধতি, প্রতারণাই সুসমাচার, অবিচারই সুবিচার, অনধিকারই অধিকার, বর্বরতাই সংস্কৃতি, অন্ধকারই আলোর অধিক,

দাম্ভিকতাই বিনয়, সন্ত্রাসই শান্তি, মৌলবাদই মুক্তি, মূর্খ অসৎ অমার্জিত ভণ্ড ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র তাণ্ডব আর নিষ্পেষণই গণতন্ত্র।

এতো নিকৃষ্টদের শাসনে বাস করার জন্যে জন্মেছিলাম, সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত। মৃত্যুর সময় হয়তো দেখে যাবো একটি পুরোপুরি গুণ্ডা আমাকে শাসন করছে; ধন্য হবে আমার মৃতদেহ।

অনেক আগেই গভীর দুঃখে আমি আমার দেশের নাম দিয়েছিলাম 'বাঙলাস্তান'; বছরে বছরে এটি অধিকতর 'বাঙলাস্তান' হয়ে উঠছে; দেশটি তিন দশক ধ'রে এতো নষ্টভ্রষ্টদুষ্টদের হাতে প'ড়ে গেছে যে এর কোনো মুক্তি নেই। এখানে ভালো আমরা খুবই কম দেখেছি, ওই স্বাধীনতাটুকু ছাড়া কী আর ভালো দেখেছি? এখানে কোনো জ্ঞান নেই, জ্ঞানের বিরুদ্ধে এখন চলছে সমস্ত কর্মকাণ্ড, সৃষ্টিশীলতা নেই, বিঁজ্ঞান নেই, শিল্পকলা নেই, এমনকি মানুষের জন্যে জীবনধারণের ব্যবস্থা নেই।

রাষ্ট্রচালকেরা– তারা খুবই নিম্নমানের মানুষ, যদিও অত্যন্ত শক্তিশালী– জনগণকে মনে করছে উচ্ছিষ্টভোজী পশুপাল, তারা নর্দমা ঘেঁটে জীবন ধারণ করবে, বা করবে না। বর্বরতা একে পিষ্ট ক'রে চলছে, মিথ্যাচার একে দূষিত ক'রে চলছে. অনধিকার মানুষকে অসহায় পশুতে পরিণত করছে। আমি কোনো মুক্তির লক্ষণ দেখি না, অন্তত আমার জীবনে মুক্তি দেখবো ব'লে মনে হয় না। বাঙলাদেশের দিকে তাকিয়ে একটি প্রশ্ন জাগে : বিংশশতক থেকে কতো কতো শতক পিছিয়ে গেলে মানুষ একবিংশ শতকে পৌঁছে?

এখন, এই চরম তমসাচ্ছন্ন সময়ে, একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে, এমনকি অবিশ্বাস্য মনে হয়, যে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, লাখ লাখ– এখানে মানুষ এতো তুচ্ছ যে লাখ একটি অতিশয় ক্ষুদ্র সংখ্যা– বাঙালি মৃত্যু বরণ করেছিলো, লাখ লাখ নারী– নারী এখানে পতঙ্গমাত্র, তারা পীড়িত হ'লে কী এসে যায়– পীড়িত হয়েছিলো, আমরা পরাক্রান্ত অশুভর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। প্রশ্ন জাগে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম? মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম? লাখ লাখ বাঙালি নিহত হয়েছিলো? উদ্বাস্তু হয়েছিলো? লাখ লাখ নারী উৎপীড়িত লুণ্ঠিত হয়েছিলো? আমরা অশুভর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম?

আজ তা রূপকথা, কিংবদন্তি, শিশুভোলানো গল্প মনে হয়।

প্রবল মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে থাকতে হয় এখন, যন্ত্রণাই এখন নিরন্তর সঙ্গী। ওই যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিলো, আজ সেটা অসম্ভব হতো, ঘটতে পারতো না; এখন কেউ অশুভর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেও পারে না, বরং অশুভকেই বরণ ক'রে ধন্য বোধ করে। বাঙালি মুসলমান (মধ্য ও উচ্চরা) বড়ো বেশি দূষিত হয়ে গেছে, তিরিশ

বছরের রাজনীতি তাদের দূষিত করেছে, তারা তিরিশটি বছরকে দূষিত করেছে। বাঙালি মুসলমানের মগজে কোনো অচিকিৎস্য রোগ আছে।

বাঙালি + মুসলমান = এটা কোনো রোগের নাম? রোগটি নতুন নয়, চ'লে এসেছে মধ্যযুগ থেকেই, এখন চরমে পৌঁচেছে। কবি আবদুল হাকিমের বিখ্যাত ক্ষোভটি মনে পড়ে; বাঙালি মুসলমানদের একটি অংশের পিতার ঠিক নেই ব'লেই তো তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৭১ ছিলো আমাদের শ্রেষ্ঠ সময়, তখন আমরা স্বাধীনতার জন্যে সব কিছু উৎসর্গ করেছিলাম।

১৯৭১-এ যদি আজকের এই বমিজাগানো, পর্যুদস্ত, মিথ্যাচারগ্রস্ত, কলঙ্কিত, মৌলবাদী, সুবিধাবাদী, শয়তানাক্রান্ত, উন্মাদশাসিত অবস্থায় থাকতাম, তাহলে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতাম না, মুক্তিযুদ্ধে যেতাম না; এ-অবস্থায় স্বপ্ন হাস্যকর– এখন আমাদের স্বপ্নমাত্রই দুঃস্বপ্ন; আমরা আজ ১৯৭১-এর থেকে পেছনে চ'লে গেছি, কতোটা পিছিয়েছি তা হিশেব করাও কঠিন, মধ্যযুগেই পৌঁছে গেছি, এখন আমরা বাঙলাদেশ নামে আরেকটি অপপাকিস্তান তৈরি করছি।

জয়ী হওয়ার পর আমরা মর্মস্পর্শীভাবে পরাজিত হয়েছি; আমরা স্বাধীনতার শোচনীয় অপব্যবহার করেছি। আমরা আমাদের সমস্ত লক্ষ্যকে পরাজিত করেছি, পরাভূত ক'রে চলছি আমাদের স্বাধীনতাকে।

পাকিস্তান–, এ-নাম শুনলেই যেখানে বমি পায়; সেখানে আমরা বাঙলাদেশকে ক'রে তুলেছি একটি অপপাকিস্তান।

একটি অপপাকিস্তান উৎপাদনের জন্যে কি আমরা পাকিস্তান বর্জন করেছিলাম? অপপাকিস্তান আমরা চাই নি, পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ সংশোধনের নামই বাঙলাদেশ; কিন্তু সেই বাঙলাদেশকেই কেটে ছেঁটে ভেঙে চুরে পিষে চেপে দুমড়ে মুচড়ে সংশোধন ক'রে ফেলা হচ্ছে।

সংশোধিত বিকৃত দোমড়ানো মোচড়ানো রোগাক্রান্ত অপপাকিস্তানিকৃত বাঙলাদেশ আমাকে সুখী করতে পারে না, কোনো সৎ ও সৃষ্টিশীল মানুষকেই পারে না; কাউকে পারে না, শুধু নষ্টভ্রষ্টদুষ্ট রাজনীতিক, আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজাকার-দালালদের ছাড়া।

১৯৬০-এর দশকের কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে; ওটিকেই আমার মনে হয় আমার দশক।

আমার সৌভাগ্য আমি ওই দশকে তরুণ ছিলাম, মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিলাম, বিকশিত হচ্ছিলাম, বিকশিত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল ছিলাম; ওই দশকের মতো অসামান্য দশক আর কখনো আসে নি বাঙালি মুসলমানের জীবনে।

ওই দশকে আমরা গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের নাম শিখেছিলাম, ওগুলো

কাম্য মনে হয়েছিলো আমাদের, যদিও ছিলাম নিকৃষ্টতম পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচারের অধীনে। বাঙালি মুসলমানের কোনো উনিশশতকি জাগরণ ঘটে নি, যেমন ঘটেছিলো হিন্দু ও ব্রাহ্মদের; এ-সমাজে কোনো রামমোহন বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথ জগদীশ জন্মে নি; আমাদের ও-ধরনের জাগরণ ঘটতে শুরু করেছিলো ১৯৬০-এর দশকে, ছোটো মাপে।

আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পড়ছিলাম তখন, তারা অনুপ্রাণিত হচ্ছিলাম অজস্র আন্তর্জাতিক সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-সমাজ-রাজনীতিক তত্ত্ব ও সৌন্দর্য দিয়ে, এমনকি নতুনভাবে পরিচিত হচ্ছিলাম আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে, যা আমাদের মধ্যে জাগরণ ঘটিয়ে চলছিলো। আমরা নিচ্ছিলাম জীবনানন্দ বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে অমিয় চক্রবর্তীকে, আমাদের আগের দশকের বাঙালি মুসলমান যাঁদের চিনতো না, বুঝতো না।

কলাভবন, শরিফ মিয়ার ক্যান্টিন, বিভিন্ন ছাত্রাবাস, নিউমার্কেটের নতুন ঝলমলে বইয়ের দোকান, এবং আরো নানা জায়গা ছিলো আধুনিকতা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও অনুপ্রাণিত হওয়ার স্থান; তখন অনাধুনিকতা, মধ্যযুগীয়তা, বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লা জোব্বা বোরকা ছিলো হাস্যকর, হিজাবের কথা কেউ জানতোই না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরতো চমকপ্রদ ট্রাউজার, মেয়েরা ঠাশা এমন সব পোশাক, যা এখনকার উপাচার্যরা দেখলে হৃদরোগে ঢ'লে পড়বে, পুলিশ ও প্রক্টররা পাগলামো করবে (এ নিয়ে অনেক আগেই মুনীর চৌধুরী লিখেছিলেন চমৎকার একটি ব্যঙ্গ কাব্যনাটক, যার নাম *মর্মান্তিক*) , ১৯২১ সালে ফিরে যাবে, শুক্রবারে তালেবান ধার্মিকেরা লাঠি নিয়ে মিছিল করবে। তখন ধর্মকর্ম সাধারণত ছিলো জামাতে ইসলামের ছাত্রশিবিরের কর্মীদের কর্ম, তাও তারা ঠিক মতো করতো না, ইসলামের থেকে মওদুদিই ছিলো তাদের কাছে বেশি প্রিয়, তাদের ধর্মবোধের প্রধান একটি ছিলো যে পরীক্ষার দিনে আণ্ডা খেতে নেই, তাহলে আণ্ডার মতো শূন্য পাওয়া যাবে। ধর্ম কী সব চমৎকার স্বর্গীয় বিশ্বাস পৌঁছে দিয়েছে আমাদের কাছে!

তখন মার্ক্সবাদ– এমনকি মার্ক্স-এঙ্গেলসের দাড়ি– ছিলো রাজনীতিক আধুনিকতা ও ফ্যাশন; যাদের দৈনিক স্বপ্ন ছিলো পাকিস্তানি আমলাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীলতায় ঢোকা, ঘুষ খাওয়া, ধনী পিতাদের নির্বোধ রূপসী কন্যাদের বিয়ে করা, তারাও এর শ্লোগান দিয়ে সুখ পেতো; আর সাহিত্য-শিল্পকলার ক্ষেত্রে আধুনিকতা ছিলো বদলেয়ার র‍্যাঁবো মালার্মে আপলিনাইর ব্রেতোঁ দালি পাউন্ড এলিয়ট জয়েস সার্ত্র কামু পিকাসো রিল্কে বেকেট ও আরো অনেকে, হাফিজ ওমর খৈয়াম ইকবাল শাহনামা আরব্যরজনীকে

বাতিল ক'রে দেয়া হয়েছিলো, হাস্যকর ছিলো ওসব জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ বা এলিয়ট বা কাফকা বা বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দের পাশে।

আজ ষাটের দশকের অনেক গোঁড়া মার্ক্সবাদীকে যখন দেখি গোঁড়া আলহজ মওলানা হয়ে যেতে, বা স্যুটকোটে সেজে ইসলামের জয়গান গাইতে, ইসলামের গুণগানে মুখর হ'তে, আধুনিক শিল্পকলাকেই ধর্ম মনে করতো এমন অনেককে যখন দেখি হামদ-নাত লিখতে ও কলেমা তয়েবা প্যাঁচাপেঁচি ক'রে আঁকতে– হয়তো ধর্ম ও দিনার উভয়ই দূষিত করছে তাদের, তখন বমি ক'রে ফেলতে ইচ্ছে করে; বমি ক'রে ফেলি।

বশিরুল্লা খলিলুল্লা সলিমুল্লারা তখন মার্ক্সবাদী ও আহমেদ বশির বা মাহমুদ খলিল বা সেলিম সলিম হয়ে উঠেছিলো, একবিংশ শতকে এসে আবার তারা বশিরুল্লা খলিলুল্লা সলিমুল্লা হয়ে উঠেছে। তারা অনেকে এখন নষ্ট ভ্রষ্ট মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, অখণ্ড বা খণ্ডিত উপাচার্য, সবাই কমবেশি মওলানা আলহজ বিসমিল্লা অলহামদুলিল্লা, সুরা ইয়াসিন সুরা বাকারা, মনে হয় না এরা ১৯৬০-এর দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো, মনে হয় তারা হয়তো খালের পাড়ের কোনো ফোরকানিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার তালেবান ছিলো।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শুদ্ধ আধুনিক বাঙালিদের, বিশ্বমানবদের, একজন, উনিশ শতকের মাঝভাগেই এটা বুঝেছিলেন; তাঁকে যখন বলা হতো বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ রহিত করার জন্যে ইংরেজের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করার দরকার নেই, শিক্ষাই একদিন একাজগুলো করবে, এসব নোংরামো দূর করবে, তিনি বলতেন তিনি তরুণ বাঙালিদের বিশ্বাস করেন না, কেননা এরা যৌবনে প্রচণ্ড বিপ্লবী ও নাস্তিক হ'তে পারে, কিন্তু বুড়ো বয়সে এরা হবে ঘোর স্বার্থপর, প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের মধ্যে কখনোই ঢোকে নি, আমরা পাশটাশ করেছি চাকুরি পাওয়ার জন্যে, জ্ঞান অর্জনের জন্যে নয়, জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার জন্যে নয়। ইয়ং বেঙ্গলদের অনেকেই পরে দুষ্ট বৃদ্ধ হিন্দু হয়েছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চাশোত্তর বয়সে, এখন আর যাকে বৃদ্ধকাল বলা যায় না, নিজেকে ও হিন্দুদের নষ্ট করেছিলেন ধর্মান্ধতা দিয়ে।

আমাদের এক পরিসংখ্যানবিদ, যিনি ১৯৫০-এর দশকে টেনিস খেলতেন, কন্যাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতে পারদর্শী ক'রে তুলেছিলেন, কিছু চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন, বুড়ো বয়সে মুখ ভ'রে দাড়ি রেখেছিলেন, মাথায় সব সময় টুপি পরতেন, খুবই অন্যমনস্ক আচরণ করতেন, তিনি তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতদক্ষ কন্যাকে বুড়ো বয়সে বলেছিলেন, জীবনে তিনি বড়ো ভুল ক'রে ফেলেছেন, পরিসংখ্যান ও পদার্থবিজ্ঞান চর্চার বদলে যদি তিনি কোরান হাদিসের চর্চা করতেন, তাহলে বেহেস্তে যেতে পারতেন, চিরকাল

সুখে থাকতে পারতেন। আমাদের আরো বহু বিখ্যাত পণ্ডিত যতো জ্ঞানচর্চা করেছেন, তার বড়ো অংশই অজ্ঞানতা চর্চা, জ্ঞান তাঁদের চর্চার বিষয় ছিলো না। বেহেস্ত নামক আষাঢ়ে গল্পের মোহ, ক্লান্তিহীন আশ্লেষের ক্ষুধা, মুসলমানদের মধ্যে আজো এতো দুর্মর, এজন্যেই মুসলমান আজো আধুনিক চেতনা আয়ত্ত করতে পারে নি।

আমাদের দেশে যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করেন, তাঁরা বুড়ো বয়সে অধিকাংশই হন বিজ্ঞানবিরোধী; অবয়বে হন মওলানামৌলবি।

এটাই দেখছি বাঙলাদেশ : ষাটের দশকের এক উগ্র 'আধুনিকা'কে সেদিন দেখলাম, এখন যে বিসর্জিত দুর্গার মতো ভেঙেচুরে গেছে, মুখে এতোটুকুও আভা নেই, একদা কলাভবনের বারান্দায় যার শরীরের বিভিন্ন বাঁকের তরঙ্গভঙ্গ দেখা আমাদের জন্যে সুখকর ব্যাপার ছিলো, যার সম্মুখ ও পশ্চাৎ ছিলো সমান জলভ্রমিপূর্ণ, এখন সে বোরকা হিজাব তাঁবু বিসমিল্লায় সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলেছে নিজেকে, কয়েকবার পবিত্র মক্কা মদিনা মনোয়ারা ঘুরে এসেছে, ধনসম্পদে নিজেকে ভ'রে ফেলেছে ও ভ'রে চলছে– এটা করতে ভুল করে নি ও পবিত্র উপায়ে করে নি, কিন্তু এখন অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে নিজেকে, বিসমিল্লা আলহামদুলিল্লা ইনশাল্লা ছাড়া কথা বলে না, ইসলামের জয়গানে সারাক্ষণ মুখর, সে জানে না তার এসবই পণ্ডশ্রম, ধর্মগ্রন্থ ও সহিহ হাদিসগুলো সে পড়ে নি–, হুররা তাকে তার কাম্য প্রাসাদে ঢুকতে দেবে না, তার সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

ষাটের দশকের এক মার্ক্সবাদী ছাত্রনেতাকে দেখলাম টেলিভিশনে, যে উঠে এসেছিলো নোয়াখালির ধর্মান্ধতা থেকে, পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে এক সময় যে কয়েক রাকাত নামাজ পড়তো বাবার পাঠানো নির্দেশ অনুসারে, এক অধ্যাপকের প্ররোচনায় ও নানা অশীল আদরে যে পরে হয়েছিলো মার্ক্সবাদের নাবালক আদিরূপ, যে অনেক সুযোগসুবিধা নিয়েছে গত দশ বছরে, এখন আরো নেয়ার জন্যে অব্যবস্থিত হয়ে আছে, তাই এখন সে ইসলামের জয়গানে মুখর, যে একদিন মার্ক্স-এঙ্গেলস্, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়া আর কিছু বুঝতো না, বলতো ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম, সে-আফিম সেবন করতে তার দু-দশক লেগেছে, আপাতত আর কিছু না পেয়ে এখন সে তার টাওয়ারের– একটি ফ্ল্যাট কিনতে সে দেরি করে নি– মসজিদ কমিটির সভাপতি হয়েছে।

এই হচ্ছে বিশশতকের ষাটের দশকের একুশশতকি পরিণতি।

স্বাধীনতার তিন দশক ধ'রে আমরা কী দেখছি?

প্রথমে অপূর্ব স্বাধীনতা ও একটি সুন্দর সংবিধান– আমি অবশ্য খুব মনোযোগ দিয়ে এটি প'ড়ে দেখি নি, আমি ধ'রেই নিয়েছি এটির দায়িত্ব হচ্ছে আমার সমগ্র অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা; সংবিধান পড়ার

থেকে সুধীন্দ্রনাথ বা হাইনের কবিতা পড়া আমার কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়। সংবিধানটি হয়তো পুরোপুরি মৌলিক নয়; এমন একটি সংবিধান মৌলিকভাবে রচনার প্রতিভা কারো ছিলো ব'লে মনে হয় না, তাঁরা হয়তো শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলো থেকে অনেক কিছু আহরণ করেছিলেন– এখন তো একেবারেই নেই, পারলে এখন এরা তালেবানদের শরিয়াকে সংবিধানরূপে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতো। ১৯৭২-এর ১২ অক্টোবরে যেটি খসড়ারূপে উত্থাপিত হয়েছিলো, ১৬ ডিসেম্বর থেকে যেটি কার্যকর হয়েছিলো, সেটি ছিলো একটি বড়ো কীর্তি; কিন্তু বাঙালির দুর্ভাগ্য তারা তাদের কীর্তিকে এক সময় ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলে।

তারপর দেখে এসেছি শুধু সংবিধানবৈরিতা, সংবিধানধর্ষণ, তার সততাহরণ (এটি খুলে দেখলে খুবই দুঃখ হয় এখন– এতে ঢুকেছে সংশোধন ও সংশোধন ও সংশোধন, তাও ইংরেজিতে, সামরিক বীরেরা এসেছে, বেয়নেট দিয়ে এটিকে খুঁচিয়ে লাশে পরিণত করেছে, এটি ফেঁপে উঠেছে– লাশ হয়ে উঠেছে), একনায়কত্ব, স্বৈরাচার, সামরিক শাসন, মানবাধিকারহীনতা, হত্যাকাণ্ড, যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরোধী অন্ধতা, বাকস্বাধীনতাহীনতা, দারিদ্র্য, সংস্কৃতিহীনতা, ফ্যাশিবাদ, নাটসিবাদ, সাহিত্যশিল্পকলাহীনতা, বর্বরতা, ধর্মান্ধতা, মসজিদ, মাদ্রাসা, মিলাদ, ওয়াজ, হজ, ওমরা, এস্তেমা, মৌলবাদ, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, ধনলুণ্ঠন, ঘুষ, চৌর্যবৃত্তি, পরিবারতন্ত্র, স্তাবকতা, দালালি, অশিক্ষা, খুন, ধর্ষণ, সাম্প্রদায়িকতা, কপটতা, দাম্ভিকতা, ধনলুব্ধতা, চরিত্রহীনতা, মূর্খের শাসন, সুবিধাবাদ, জল্লাদ ও ডাকাতদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়াভিযান, তেলাপোকাদের সিংহত্ব, ইতিহাসবিকৃতি; এবং এখন তা শোচনীয়তম পাতালে নেমেছে।

এখন সুস্থ থাকা অসম্ভব, দেশটি হয়ে উঠেছে পাগলাগারদ, হিংস্র পাগলদের দ্বারা শাসিত। যে-দিকেই তাকাই পাগল দেখতে পাই; মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি সচিব দারোগা ইত্যাদির কথা শুনলে সন্দেহ জাগে, অর্থনীতিবিদদের কথা শুনলে সন্দেহ জাগে– অনেক কাবুলিঅলা দেখা দিয়েছে অর্থনীতিবিদরূপে– পুরস্কারে থলে ভ'রে ফেলছে; ধার্মিকদের কথা শুনলে সন্দেহ জাগে, কবিদের কথা শুনলেও সন্দেহ জাগে, এমনকি পাগলদের কথা শুনলেও সন্দেহ জাগে। সারাটি দেশ এখন পাগল হয়ে উঠেছে, পাগলরা নির্দেশ দিচ্ছে, পাগলরা বিধান দিচ্ছে, পাগলরা উদ্বোধন করছে; এমন আদিগন্ত ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় সুস্থ থাকা বড়োই অসুস্থতা।

পাকিস্তান চাই নি ব'লে আমরা আমাদের একটি দেশ চেয়েছিলাম, যা আমাদের আপন, যার মাটি নদী আকাশ গ্রাম নগর ধানখেত খাল বিল কাঁঠাল পাতা আমাদের, যা স্বাধীন, যাকে আমরা সৃষ্টি ক'রে নেবো

আমাদের শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্যে, আমাদের কল্যাণের জন্যে। আমাদের পিতারা জন্মেই শাদা প্রভুদের দেখেছিলো, তারা উদ্বাস্তু ও দাস ছিলো নিজেদের দেশে, এবং আমরা জন্মেই আরেক ধরনের প্রভু দেখেছিলাম, যারা ছিলো শাদাদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট। একটি ক্লাইভ ও একটি আইউব-ইয়াহিয়ার মধ্যে পার্থক্য মানুষ ও জন্তুর। শাদাদের শিক্ষা ও সভ্যতা ছিলো, তাদের অত্যাচারের মধ্যেও ছিলো এক ধরনের মনুষ্যত্ব, যা পাকিস্তানি বিশাল দেহের অসভ্যদের ছিলো না।

আমাদের পিতারা একটি মারাত্মক ভুল, অপরাধ, করেছিলো, তারা বাঙলাকে পাকিস্তান ক'রে তুলেছিলো।

পাকিস্তানের প্রভুদের অধীনে তারা হয়েছিলো থুতুপায়ী গোলাম। গোলামিকেই তারা স্বাধীনতা মনে করেছিলো, কায়েদে আজম-কায়েদে মিল্লাত জাতীয় নোংরা হাম্‌দ্‌-নাতে তারা মুখর হয়েছিলো, এবং আমাদের গোলামের সন্তানে পরিণত করেছিলো।

আমরা গোলামের সন্তান থাকতে চাই নি, দাস থাকতে চাই নি, ব'লেই সৃষ্টি করেছিলাম বাঙলাদেশ।

মনে করা যাক বাঙলাদেশ স্বাধীন হয় নি, এখনো এটি পূর্ব পাকিস্তান; তাহলে আমরা চারপাশে কী দেখতাম? দেখতাম চানতারার নিশান, শুনতাম পাক সারজমিন সাদবাদ তুনিশানে আজমে আলিশান, পথে পথে উর্দু, রিক্সাঅলারা পথ মাতিয়ে গাইতো 'রিক্সাওয়ালা মাতোয়ালা', 'মাস্টারজি ছবক বোলাদো', সিনেমা তৈরি হতো 'তালাশ', 'বাহানা', 'চান্দা, 'বানজারান' নামে, অনেক জহির রায়হান মোস্তাফিজই তাতে মেতে উঠতো– আমরা তো তা দেখেছি, বাসকন্ডাকটর ছেলেগুলো চিৎকার করতো, 'রোক্কে'; বঙ্গভবনে (এর নাম হয়তো হতো জিন্না বা আইউবমহল, যেমন গুলশান কাহকাশানে আজো দেশ ছেয়ে আছে) থাকতো কোনো পাঞ্জাবি, উজিররা আসতো পাকিস্তান থেকে, দৈনিক পত্রিকার পাতায় পাতায় থাকতো তাদের কিম্ভূত সব ছবি, সচিবালয়ের সচিবগুচ্ছরা হতো পাঞ্জাবি ইসলামাবাদি, সৈন্যাবাসগুলোতে মেজর থেকে ব্রিগেডিয়ার ও জেনারেলরা হতো পাঠান পাঞ্জাবি, কোটিপতিরা হতো পাকিস্তানি, পথে পথে গাড়িতে হাসতে হাসতে চলতো পাঞ্জাবি সিন্ধিরা, এখন যারা পাজেরোতে শহর কাঁপিয়ে চলে, তারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পাজেরোর গর্জনে কাঁপতো, এটা হতো আদমজি দাউদ বাওয়ানি কাবুলিঅলাদের দেশ। আমরা আমাদের দেশে থাকতাম শূদ্রের মতো।

আমরা তুচ্ছরা তাদের পদধুলি চেটে ধন্য হতাম।

বারবার মনে পড়ে আমার সে-তরুণটির কথা, যে শেরাটনে প্রচুর পানের পর বলেছিলো, অই যে মুক্তিযুদ্ধটা, অইটার জন্যেই আমি আজ

এখানে ঢুকে মাতাল হ'তে পারলাম, নইলে আমি এর দারোয়ানও হ'তে পারতাম না। এখন যারা সচিবটচিব জেনারেল টেনারেল প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীটন্ত্রি মহাপরিচালক তারা যে কোথায় থাকতো, কোথায় পচতো, তা তারাও জানে না; তারাও ওসব জায়গার দারোয়ান হ'তে পারতো না। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের অসাধারণেরাও পাকিস্তানে থাকতো গালভাঙা ধুলোচাটা ভিখিরি বাঙালি মুসলমান। উপসচিব আর কর্নেল হ'তে হ'তেই তারা দুমড়ে মুচড়ে যেতো; আর কোথায় থাকতো আমাদের ৩২,০০০ কোটি টাকার ঋণখেলাপিরা? ঋণখেলাপ করার মতো একটি কানাকড়ি পেতো তারা? স্বাধীনতার সোনা বাঙলাদেশে যারা সবচেয়ে বেশি নিজেদের ঘরে তুলেছে অবৈধভাবে, তারাই সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাঙলাদেশের সঙ্গে।

ইতিহাসের একটি বড়ো অংশ, অধিকাংশ অধ্যায়, চিরকালই বিকৃত, কেননা তা সাধারণত জয়ীদের কৃপাভোগীদের হাতে লেখা জয়ীদের জয়গান, আর পরাজিতদের বিরুদ্ধে অশ্লীল কুৎসা। তবে বাঙলাদেশের ইতিহাস এখন চরম বিকৃত, কেননা এখানে উঞ্ছভোগীদের সংখ্যা খুবই বেশি। ঐতিহাসিক সততা আমাদের নেই, আমরা পারি ইতিহাস লেখার নামে স্বার্থ চরিতার্থ করতে। বাঙলাদেশের আওয়ামি ইতিহাস এক রকম, জাতীয়তাবাদী-জামাতি ইতিহাস তার সম্পূর্ণ উল্টো; একজনের মহানায়ক আরেকজনের খলনায়ক; ইতিহাসবিকৃতির নামই বাঙলাদেশের ইতিহাস।

একদল ক্ষমতায় এলে তাদের বীরদের নাম সোনার অক্ষরে লেখে যেখানে সেখানে, আরেক দল এসে সেগুলো মুছে ফেলে নিজেদের বীরদের নাম হীরের অক্ষরে লেখে বিমানবন্দর থেকে অলিগলিতে। পরাজিতরা যখন জয়ী হয়ে উঠে ইতিহাস লিখতে থাকে, তখন যতোটা বিকৃতি ঘটতে পারে ততোটাই ঘটছে বাঙলাদেশে।

এখানে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী খুবই কম; বদ্ধিজীবী নামে যারা আছে, তারা মোটামুটি অশিক্ষিত, তবে সেটা কোনো অপরাধ নয়, প্রকৃত শিক্ষা দরিদ্র দেশে অর্জন করতে না পারাই স্বাভাবিক, তবে এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য চরিত্রহীনতা, এরা মূর্খ শক্তিমানদের মুঠো থেকে ক্ষুদকুঁড়ো ভিক্ষে পেতে চায়, তাই এরা পেছনের সারির কর্মী হয়ে ওঠে বিভিন্ন দলের; এবং দলের মুখের দিকে তাকিয়ে যে-কোনো শ্লোগান দেয়, বাঁধাবুলি আবৃত্তি করে।

তাদের সাধ শক্তিমানদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া।

স্বাধীনতার এক বা দু-দশক পরে মার্কিন ক্ষমতাধিকারীরা যদি বলতো যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আন্দোলনে ওয়াশিংটন ও তাঁর সঙ্গীদের কোনো ভূমিকা নেই, তাহলে যা হতো, তাই হয়েছে আজকের বাঙলাদেশে। মার্কিনরা বাঙালি মুসলমানের মতো বিকৃত ছিলো না, নষ্ট ছিলো না,

এখনো নেই; তারা তাদের মহানদের গৌরব দিয়ে এসেছে, তাঁদের রচিত সংবিধান প্রাণপণে রক্ষা ক'রে এসেছে; কিন্তু আমরা তুচ্ছ বিকৃত বাঙালি মুসলমান স্বাধীনতার প্রধান পুরুষদের খুন করেছি, অবজ্ঞা করেছি, তাঁদের নাম পর্যন্ত মুছে ফেলে গৌরব বোধ করেছি।

এটাই স্বাভাবিক আমাদের জন্যে– আমাদের রক্তেই দোষ রয়েছে। মার্কিন প্রধান বিচারালয়ের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে স্বাধীনতার স্রষ্টাদের প্রণীত সংবিধান সমস্ত বিপন্নতার মুখেও রক্ষা করা, কিন্তু আমাদের প্রধান বিচারালয় সেটিকে বিভিন্ন দুর্বৃত্তের পায়ের নিচে দলিত হ'তে দেখে কখনোই দুঃখ পায় না।

যে-জাতি সত্যকে মেনে নেয় না, সত্যকে লালন করে না, তার মতো ঘৃণ্য ও ভবিষ্যৎহীন আর কেউ হ'তে পারে না।

আমি কখনো শ্লোগান দিই নি, কারো স্তব করি নি, কারো দিকে মাথা নত করি নি, করবোও না কখনো; কিন্তু সত্যকে মেনে নিতে কখনো দ্বিধা করি নি। আমার বন্ধুরা অনেক মহাপুরুষের জয়গান গেয়ে কবিতা লিখেছেন, আজো লিখছেন, বক্তৃতায় অনেকের স্তবে মুখর হয়েছেন, আমি লিখি নি, মুখর হই নি; কিন্তু সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধা করি নি, এবং যে-কোনো আরাধ্য ব্যক্তি ও বিশ্বাসের সমালোচনা করতেও দ্বিধা করি নি। কেননা কারো কাছে আমি কিছু চাই নি। আমি কারো দলে নেই।

১৯৭১-এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টি আমার মনে পড়ে, যদিও স্মৃতি এরই মাঝেই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। তখন আমি ছিলাম ২৪, এর মাঝে এতো বছর কেটে গেছে, এতো কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার স্মৃতি কি সবুজ পাতার মতো থাকতে পারে?

১৯৭০-এর নভেম্বর ডিসেম্বরে কি আমি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম?

কেউ চেয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানে? মুজিব চেয়েছিলেন?

অন্য কেউ চেয়েছিলো? তখন স্বাধীনতার কথা ভাবতে ভয় লাগতো না? তখন আমরা শুনতাম স্বায়ত্তশাসনের কথা। তখন কে ছিলো সবচেয়ে পরিচিত, বিখ্যাত, কেন্দ্র? বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ? তাঁরা তো কালাতিক্রমী, তাঁদের কেউ উৎখাত করতে পারে না। ওটি শৈল্পিক কাব্যিক ব্যাপার ছিলো না, ছিলো রাজনীতিক; ওই রাজনীতিক আকাশে একটিই নক্ষত্র ছিলো, তাঁর নাম সূর্য ছিলো না, ছিলো শেখ মুজিব। এককালের এক উত্তেজিত ছাত্রনেতা পরে হয়ে উঠেছিলেন মহানেতা।

আমি কখনো তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' বলি নি। দেবতাদের পুজো করার জন্যে ভক্তরা ১৯৯টা নাম তৈরি করে। আমার কোনো দেবতা নেই।

ওটা রাজনীতিক শ্লোগান, ভক্তরা যেমন দেবতাদের বিভিন্ন নামে ভূষিত করে, এটাও তেমন একটি অভিধা; ভক্তরা বিভিন্ন অভিধায় তাদের

দেবতাকে পুজো ক'রে দেবতার কিছু মহিমা নিজের ভেতরে সঞ্চারিত করে ধন্য ও শক্তিমান হওয়ার জন্যে। আমার কবিতায় দু-একবার তাঁর নাম এসেছে, তাও মুজিব, সঙ্গে কোনো অভিধা নেই।

তবে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন আমাদের রাজনীতির প্রধান পুরুষ, এবং ঐতিহাসিক বিচারেও তাঁর সঙ্গে তুলনীয় আর কোনো বাঙালি রাজনীতিবিদ নেই। সোহরাঅর্দি? ফজলুল হক? ভাসানি? তাঁর পাশে অগ্রজরা মাঝারি, অনুজরা তুচ্ছ ও হাস্যকর। তিনি শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করেন নি, তিনি যুগান্তর ঘটানোর রাজনীতি করেছেন। তিনি শুধু রাজনীতিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন নি, তিনি যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন রাজনীতিক ধারার, যেমন কবিতায় যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বা ত্রিশের কবিরা।

তাঁকে ঘিরেই আলোড়িত ও বিস্ফোরিত হয়ে চলছিলো বাঙলাদেশের, তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের, রাজনীতি; অর্থাৎ তিনিই আলোড়িত-বিস্ফোরিত ক'রে চলছিলেন আমাদের রাজনীতিক মণ্ডলটিকে; এবং তাঁর পাশে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর সমকালীন ও প্রাক্তন সকল বঙ্গীয় রাজনীতিবিদ। আমি রাজনীতিবিদদের ভক্ত নই, কখনো তাঁদের স্তব করি নি; তবে তাঁদের ভূমিকা ও মূল্য কিছুটা বোঝার চেষ্টা করি। শেখ মুজিব দৈহিকভাবেই মহাকায় ছিলেন, সাধারণ বাঙালির থেকে অনেক উঁচুতে ছিলো তাঁর মাথাটি– সহজেই চোখে পড়তো তাঁর উচ্চতা, এবং আমাদের বামন রাজনীতিবিদদের মধ্যেও তিনি ছিলেন মহাকায়।

অনেক সময় আমার মনে হয় বাঙালিদের মধ্যে তাঁরাই মহৎ, যাঁরা পেরিয়ে যান বাঙালিত্বের ক্ষুদ্র সীমা, যেমন পেরিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, ও আরো অনেকে। বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এই সীমা পেরোতে পেরেছেন খুবই কম। মহান বাঙালিরা বাঙালি থেকেও সীমা পেরিয়ে গিয়েছিলেন বাঙালিত্বের, রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এই সীমা পেরোতে পেরেছিলেন একমাত্র মুজিব। তাঁর স্তবকারীরা যে তাঁকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব'লে স্তব করে, সেটা স্তবমাত্র, এ-স্তব তাঁকে নষ্ট করেছিলো, তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ বাঙালি আছেন আরো অনেকে; কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে তিনি অদ্বিতীয়।

রাজা ও রাজনীতিবিদদের অতিশায়িত ক'রে দেখার একটা মত্ততা রয়েছে মানুষের মধ্যে, এমনকি কবি ও শিল্পীদের মধ্যে, কেননা সাধারণেরা ক্ষমতাকে অত্যন্ত মূল্য দেয়, তারা দেখে সবার ওপরে ক্ষমতাই সত্য, আর কবি-শিল্পীদের একটি প্রথাগত কাজই হচ্ছে রামায়ণ-ইলিয়াড লেখা, গির্জার দেয়ালে মেডোনার ছবি আঁকা, স্তব করা, সাধারণের বিশ্বাসকে আরো আকর্ষণীয় ক'রে তোলা। কিন্তু আমি যেহেতু ক্ষমতাকে খুবই কম

মূল্য দিই, আসলে কোনো মূল্যই দিই না, আমি জানি ইতিহাস অনেক সময় তুচ্ছ ইঁদুরকে সিংহরূপে প্রসব করে, আমার চোখের সামনেই তো কতো তুচ্ছকে দেখলাম মহৎ হয়ে যেতে; তাই সভ্যতার অন্যান্য এলাকার শ্রেষ্ঠদের থেকে তাঁদের আমি অনেক গৌণ, তুচ্ছ, মনে করি।

কিন্তু মানুষকে সাধারণত বাস করতে হয় তুচ্ছদের অধীনে।

ইতিহাসের অনেক বীরই ইতিহাসের পরিহাস– কৌতুক, যেমন বলেছেন কার্ল মার্ক্স পরিস্থিতির বুদ্বুদ, তারা ভালো জেলে বা কর্মকার বা চর্মকারও হ'তে পারতো না। রবীন্দ্রনাথের পাশে গান্ধি বা মুজিব খুবই গৌণ, অন্যদের কথা ছেড়েই দিলাম– তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতির এলাকায়; এবং আমাদের রাজনীতিক জীবনে মুজিব অতুলনীয়। কচ্ছপ বেঁচে থাকে কয়েক শো বছর, সিংহ বাঁচে কয়েক বছর; কিন্তু কচ্ছপ হচ্ছে কচ্ছপ, আর সিংহ হচ্ছে সিংহ।

জনগণ সাধারণত, প্রাত্যহিক জীবনে, খড়কুটো বা নিস্তরঙ্গ জলরাশি বা ঘুমিয়ে থাকা অগ্নিগিরির মতো; জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাদের মনে হয় তুচ্ছ ও বিবর্ণ ও অসহায়, তারা তাদের জীবন নিয়ে থাকে বিপর্যস্ত বা ছোটোখাটো সুখে সুখী। আমাদের মতে দরিদ্র দেশে তারা অত্যন্ত মলিন, আপাতদৃষ্টিতে ভাঙাচোরা, তাদের মধ্যে কোনো প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে, তা টেরই পাওয়া যায় না। কখনো কখনো কোনো নেতা আসেন, যিনি ওই খড়কুটোকে ক'রে তোলেন দাবানল, জলরাশিকে তীব্র প্লাবন, এবং ঘুমন্ত অগ্নিগিরিকে জাগিয়ে তোলেন, চারদিকে লাভাস্রোত বইতে থাকে। এ-কাজটি করেছিলেন মুজিব।

জনগণকে ভুল পথেও নিয়ে যাওয়া যায়; হিটলার-মুসোলিনির মতো একনায়কেরাও জনগণকে দাবানলে, প্লাবনে, অগ্নিগিরিতে পরিণত করেছিলো, তা ছিলো অশুভ দাবানল, প্লাবন, অগ্নিগিরি, যার পরিণতি হয়েছিলো ভয়াবহ। জনতাজাগানো নেতারা জনগণকে সৃষ্টি করতে পারে, আবার নষ্ট করতে পারে। তারা জনগণকে উন্মাদ মগজহীন প্রাণীতে পরিণত করেছিলো। ১৯৭১-এর মার্চে শেখ মুজিব সৃষ্টি করেছিলেন শুভ দাবানল, শুভ প্লাবন, শুভ অগ্নিগিরি, নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি মুসলমানকে, যার ফলে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম।

জনগণকে যখন জাগানো হয়, তখন তাদের সামনে একটি বা কয়েকটি মহান লক্ষ্য তুলে ধরতে হয়, তখন আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিলো স্বাধীনতা; স্বায়ত্তশাসনকে তখন আর আমাদের কাছে মূল্যবান মনে হয় নি। এ-ধরনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে কতকগুলো রূপকপ্রতীকও দরকার হয়, যেগুলো জনগণের ঘুমন্ত চেতনালোককে আলোড়িত করে, সবাইকে একই আবেগে উদ্বেলিত করে, ওই রূপকপ্রতীকগুলোকে তখন

মনে হয় পবিত্র, ঐন্দ্রজালিক, ওগুলো তখন যৌথ চেতনা ও প্রেরণার মতো কাজ করে। আধুনিক জীবনে তৈরি হয় প্রাচীন পুরাণ।

একনায়কেরা সাধারণত জাগিয়ে তোলে তাদের প্রাচীন কিংবদন্তি, মানুষের মনকে ঘোলাটে ক'রে তোলে, মানুষকে এলোমেলো ক'রে তোলে, তাদের ভেতর জাগিয়ে তোলে আদিম উন্মত্ততা; যেমন করেছিলো হিটলার আর্যপুরাণ, নীলরক্তের পুরাণ জাগিয়ে, যেমন করতে চেষ্টা করেছিলো পাকিস্তানি একনায়কেরা ইসলামি পুরাণ জাগিয়ে তুলে। শেক্সপিয়র বলেছিলেন, জনতার অনেক মাথা, কিন্তু ভেতরে কোনো ঘিলু নেই; এটাকে ব্যবহার করে একনায়কেরা, তাদের মাতিয়ে তোলে।

তিনটি রূপকপ্রতীক আমরা পেয়েছিলাম একাত্তরের মার্চে।

একটি জাতীয় সঙ্গীত– 'আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', যেটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত জাতীয় সঙ্গীত, যাতে কোনো উগ্রতা নেই, আছে শুধু প্রকৃতিপ্রেম; দ্বিতীয়টি এক অপূর্ব জাতীয় পতাকা, যাতে ছিলো সবুজের মাঝে সূর্যের মধ্যে বাঙলাদেশের মানচিত্র, তৃতীয়টি হৃদয়কাঁপানো স্বদেশজাগানো শ্লোগান : 'জয় বাঙলা'। এ-তিনটি রূপকপ্রতীক দিয়ে মার্চ ও তার পরের মাসগুলো আলোড়িত ও মুখরিত ছিলো; এগুলো ছিলো পুরোপুরি পাকিস্তানি চেতনার বিপরীত, এবং আবেগ ও শৈল্পিকভাবে অনেক উৎকৃষ্ট।

'পাকসারজমিন সাদবাদ'-এর পাশে 'আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালোবাসি', চানতারার পাশে সূর্যের ভেতরে বাঙলাদেশের মানচিত্র ছিলো চেতনাগতভাবে ভিন্ন ও শৈল্পিক; আর 'জয় বাঙলা' শ্লোগানটি ছিলো বাঙালির হৃদয়ের উল্লাসের মতো।

'নারায়ে তকবির', 'আল্লাহু আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'-এর মতো মধ্যযুগীয়তার পাশে 'জয় বাঙলা' ছিলো সঙ্গীতের মতো। এর আগে বাঙালি কখনো এতো তীব্র, সংহত, ও তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোগান দেয় নি, যাতে একটি পদেই প্রকাশ পেয়েছে রাজনীতি, সংস্কৃতি, দেশ, ভাষার সৌন্দর্য ও জাতীয় আবেগ।

এসবই ছিলো, তবে একাত্তরের পঁচিশে মার্চের সন্ধ্যায়ও আমি, আরো অনেকের মতো, বুঝি নি আমরা স্বাধীনতার দিকে যাচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধের দিকে যাচ্ছি। শেখ মুজিবও কি বুঝেছিলেন?

বাসনা জেগে উঠেছিলো স্বাধীনতার জন্যে, কিন্তু কীভাবে তার বাস্তবায়িত হবে, তা জানি নি; হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে (এখন নাম *শেরাটন*) দিনের পর দিন যে-গোপন আলোচনা চলছিলো, তা বাইরে এসে পৌঁছোতো না, আমরা পথে পথে 'জয় বাঙলা' শ্লোগান দিয়ে, 'আমার সোনার বাঙলা' গেয়ে, লাঠি নিয়ে মিছিল ক'রে, স্বপ্ন দেখে চলছিলাম, আর

চক্রান্তকারীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে ও প্রতারিত হয়ে চলছিলেন মুজিব।

স্বাধীনতা লাভের পথ অবশ্য একটি নয়, অনেক; নানা পথে নানা রূপে স্বাধীনতা এসেছে নানা জাতির জীবনে, এবং আমরা সম্ভবত স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে সবচেয়ে ভাগ্যবান– সবচেয়ে কম সময়ে এ-অসাধারণ জিনিশটি আমরা পেয়েছি, যদিও আমরাও প্রচুর রক্ত দিয়েছি। পরিস্থিতি প্রসন্ন না হ'লে– তখন যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকতো, ইন্দিরা গান্ধি না থাকতেন– আমাদের আরো অনেক রক্ত দিতে হতো, হয়তো আরো মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হতো।

পাকিস্তানি ধূর্ত রাজনীতিক ও বর্বর চেঙ্গিশ সেনাপতিরা এমন গোষ্ঠি ছিলো না, যাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে, যুক্তিতর্ক ক'রে, আমরা স্বাধীনতা পেতে পারতাম; তারা বেছে নিয়েছিলো তাদের প্রিয় সরল একমাত্র চেনা পথ, রাইফেলের পথ, এতে তারা ঐতিহাসিকভাবেই দক্ষ– অন্তত তাই তারা মনে করতো; তারা মনে করেছিলো কামান চীনা রাইফেল বোমা বেয়নেট বোমারু বিমান দিয়ে সহজেই আমাদের পর্যুদস্ত করতে পারবে, পাকিস্তান টিকে থাকবে রোজহাশর পর্যন্ত।

তাদের বিশ্বাস ছিলো রাইফেলে বেয়নেটে, তারা বুঝতে পারে নি অনেক সময় রাইফেল বেয়নেট কোনো কাজে আসে না; তাদের আস্থা ছিলো তাদের প্রভু চীন ও আমেরিকার ওপর, ভেবেছিলো বেশি বিপদ হ'লে চীন ও আমেরিকা তাদের ত্রাতা হিশেবে দেখা দেবে। তারা নিশ্চিত ছিলো একরাতের প্রচণ্ড আক্রমণে সব নীরব হয়ে যাবে পূর্ব রণাঙ্গনে, শুধু লাশ প'ড়ে থাকবে পথে পথে, ওই লাশের ওপর দিয়ে চলবে তাদের ট্যাংক, তার ওপর উড়বে চানতারা, পতপত করবে পাকিস্তান।

মুজিবকে পাকিস্তানিরা বন্দী করেছিলো, খুনও করতে পারতো, তাদের জন্যে এটাই স্বাভাবিক ছিলো; তবে তাদের মতো মগজহীনেরাও হয়তো বুঝতে পেরেছিলো যে বন্দী মুজিবের থেকে নিহত বা শহিদ (শহিদ শব্দটি আমার পছন্দ নয়, এর বাঙলা কি হ'তে পারে নিহত-অমর?) মুজিব হবেন অনেক বেশি জীবন্ত ও শক্তিশালী। তারা বুঝেছিলো বন্দী মুজিবকে হয়তো দমন বা প্রতারণা করা যাবে, কিন্তু শহিদ মুজিবকে দমন বা প্রতারণা করা যাবে না; তখন তিনি হয়ে উঠবেন অপরাজিত, অজেয়, অদম্য।

মুজিবকে কখনো আমি কাছে থেকে দেখি নি, বাসনাও কখনো হয় নি, আমি বীরপুজোরী নই,– বেশ দূর থেকে কয়েকবার তাঁকে দেখেছি, তাঁর স্তবও কখনো করি নি; রাজনীতিক মহাপুরুষদের প্রতি আমি বিশেষ আকর্ষণ/শ্রদ্ধা বোধ করি না। মুজিব যে বন্দী হয়েছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময়টি ভ'রে কারারুদ্ধ ছিলেন পাকিস্তানে, একে তাঁর শত্রুরা দীর্ঘকাল ধ'রে নিন্দা ক'রে আসছে; তারা খুব অশ্লীলভাবে ব্যাপারটিকে নিজেদের

স্বার্থে ব্যাখ্যা ক'রে সুখ পায়। মুষিকছানারা নিন্দা করে সিংহের।

আমাদের শোচনীয় দেশে সব ধরনের ব্যাখ্যাই সম্ভব, মিথ্যে এখানে খুবই শক্তিমান, অনেকটা আমাদের মায়ের বুলি, এবং নির্লজ্জভাবে তা প্রচার করা যায়। মুজিব যদি ধরা না দিয়ে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করতেন, কোনো ভাঙা বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন, তাহলে কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আরো তীব্র, আরো সফল হতো? তাহলে কি তিনি মুজিব হতেন? তাহলে তো তিনি হতেন মেজর জিয়া। মুজিব পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না, তিনি মুজিব হতেন না, হতেন সামান্য 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', এবং আমরা একটি বিশাল রাজনীতিক ভাবপ্রতিমাকে হারাতাম, মুক্তিযুদ্ধে আমরা এতো অনুপ্রেরণা বোধ করতাম না। যোদ্ধা মুজিবের থেকে বন্দী মুজিব ছিলেন অনেক শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ক, তিনি তখন হয়ে উঠেছিলেন মহানায়ক, ঘোষকের থেকে অনেক ওপরে যাঁর স্থান।

মুক্তিযুদ্ধের সময়টি ভ'রে তিনিই ছিলেন নিয়ন্ত্রক ও প্রেরণা, তিনিই ছিলেন, এক অর্থে, মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তানের কারাগারে তিনি হয়তো মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতেনও না, পাকিস্তানিরা তাঁকে তা জানতে দেয় নি, মুক্তিযুদ্ধের রূপ কী তা হয়তো তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি; কিন্তু সমগ্র বাঙালির রূপ ধ'রে তিনিই ক'রে চলছিলেন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে প্রতিটি বাঙালি ও মুক্তিযোদ্ধাই ছিলো মুজিবের দ্বিতীয় সত্তা।

মুজিবের বন্দীত্ব মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার থেকে অনেক বড়ো ঘটনা।

ঘোষণা ক'রে ঘোষক হওয়া যায়, মুজিব হওয়া যায় না।

২৫-এ মার্চের পর সব বাঙালিরই, নিজেদের জীবন নিয়ে নিরন্তর ভয়ের মধ্যেও, পরস্পরের কাছে সবচেয়ে বড়ো ও আবেগকাতর প্রশ্নটি ছিলো, 'মুজিব কোথায়? তিনি কি বেঁচে আছেন?' তাদের মনে হতো মুজিব বেঁচে থাকলে তারাও বেঁচে থাকবে। দেশ বেঁচে থাকবে, মুক্তির বাসনা বেঁচে থাকবে। ২৮-এ মার্চে যখন প্রথম উদ্বেলিত উত্তেজিত কম্পিত স্বরে মেজর জিয়ার ঘোষণাপাঠ শুনলাম, তখনই জেনে আলোড়িত হলাম যে মুজিব বেঁচে আছেন, তাঁদের সঙ্গে আছেন; এটা এক মহাস্বস্তি ও প্রেরণা নিয়ে এসেছিলো; তখন বুঝতে পারলাম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

২৬-এ মার্চের দুপুরে আকাশবাণী বাঙলা ও ইংরেজিতে বারবার ঘোষণা করছিলো, 'পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, সিভিল ওয়ার হ্যাজ ব্রোকেন আউট ইন ইস্ট পাকিস্তান', তাতে ভয় পেয়েছিলাম, কেননা গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না, এবং ভয়াবহ ধারণা ছিলো, কিন্তু ২৮-এ মার্চে তা পরিণত হয় মুক্তিযুদ্ধে।

ওই ঘোষণায় বাঙলা ও ইংরেজিতে, কম্পিত ও আবেগস্পন্দিত কণ্ঠে,

স্পষ্ট ক'রে বলা হয়, যদিও খুবই অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো, যে মুজিব জীবিত আছেন, তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। মুজিবের পক্ষে ঘোষণা পাঠ করছেন একজন মেজর, যাঁর নাম মেজর জিয়া।

কে মেজর জিয়া? তাঁর নাম তো কখনো শুনি নি।

একটি ঘোষণাপাঠের ফলে, তাঁর কাঁপাকাঁপা কণ্ঠের আবেগে, মুহূর্তেই তিনি এক নতুন নায়ক হিশেবে দেখা দেন। অনেক সময় হঠাৎ কেউ কেউ অসাধারণ হয়ে ওঠেন, এজন্যে লাগে সুযোগ ও আকস্মিকতা। কেউ হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বা মুজিব বা আইনস্টাইন হয়ে উঠতে পারেন না, কিন্তু কেউ কেউ হঠাৎ মেজর জিয়া হয়ে উঠে সারাদেশকে আলোড়িত করতে পারেন। এটা হঠাৎ আকাশে মহাগোলমাল থেকে উদ্ভূত নক্ষত্রের মতো। কিংবদন্তি সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে মুহূর্তে, আকস্মিকভাবে, ঐতিহাসিক সুযোগে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা মুজিব বা আইনস্টাইন হওয়ার জন্যে লাগে দীর্ঘ সাধনা।

ওই কাঁপাকাঁপা, অনভ্যস্ত, স্খলিত বাঙলা ও ইংরেজি ঘোষণাটির আগে আমরা কি কেউ জানতাম কে মেজর জিয়া? তাঁর কণ্ঠস্বর ও ঘোষণা আমাদের সঞ্জীবিত করেছিলো, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিলো আমাদের? কোনো ধারণা ছিলো না, কিন্তু মুহূর্তেই ধারণা হয়ে যায়, আমরা কল্পনায় একজন অদম্য তরুণ মেজর ও যোদ্ধাকে দেখতে পাই। তিনি যদি বলতেন, 'আমি মেজর জিয়াউর রহমান বলছি', তাহলেও তিনি এতোটা দাগ কাটতে পারতেন না, আমরা হয়তো একজন ক্লান্ত বুড়ো মেজরের কথা ভাবতাম, যে পদোন্নতি পায় নি, দেহে শিথিল হয়ে গেছে, কেননা ওইটিই বাঙালিদের জন্যে স্বাভাবিক ছিলো পাকিস্তানে; মেজর ও জিয়া, এ-দুটি শব্দের সমাবেশ খুবই উদ্দীপক ছিলো।

তবে এটি ছিলো এক ঐতিহাসিক আকস্মিকতা ও সুযোগ, যাতে একজন সাধারণ মেজর অসাধারণ যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন, সারা জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কিন্তু তিনি অপরিহার্য ছিলেন না, কালুরঘাটের বেতারযন্ত্রীরা যদি অন্য কোনো মেজরকে পেতেন, তাকে দিয়ে ঘোষণা করাতেন, তাহলে তিনিই হয়ে উঠতেন কিংবদন্তি।

কালুরঘাটের বেতারযন্ত্রীরা একজন মেজরকে খুঁজেছিলেন কেনো? তাঁদের মনে নিশ্চয়ই অনেক ভাবনা ছিলো; তাঁদের হয়তো ধারণা হয়েছিলো একজন মেজরকে দিয়ে ঘোষণা করালে সেটা বৈদ্যুতিকভাবে কাজ করবে। করেওছিলো তাই।

মেজর জিয়া হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আকস্মিক কিংবদন্তি।

এটা আর কারো ভাগ্যে জোটে নি।

এর পর মেজর জিয়া কোন যুদ্ধাঞ্চলের প্রধান ছিলেন, কতোটা যুদ্ধ করেছিলেন, আদৌ করেছিলেন কি না, কতোটা দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তা

আর মূল্যবান নয়; তাঁর থেকে হয়তো অনেকেই অনেক বেশি যুদ্ধ করেছিলেন, অনেক বেশি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, অনেকেই তো বরণ করেছিলেন মৃত্যু; কিন্তু তাঁদের পক্ষে মেজর জিয়ার মতো কিংবদন্তি হয়ে ওঠা সম্ভব ছিলো না; তাঁরা কেউ কালুরঘাট থেকে ঘোষণার ঐতিহাসিক আকস্মিক সুযোগটি পান নি।

কালুরঘাট সৃষ্টি করেছিলো মেজর জিয়াকে : একটি কিংবদন্তিকে।

কিংবদন্তির মূল্য রাজনীতিতে, ধর্মে, সাধারণের কাছে অত্যন্ত বেশি, কেননা তা ইন্দ্রজাল ও অলৌকিকতার মতো। সাধারণ মানুষ সত্য দিয়ে যতোটা আলোড়িত উদ্বেলিত হয়, তার থেকে অনেক বেশি আলোড়িত হয় কিংবদন্তি ও ইন্দ্রজাল দিয়ে। মেজর জিয়া পরে মেজর জেনারেল হয়ে ছিলেন, তবে মেজর জেনারেল জিয়ার থেকে মেজর জিয়া অনেক বড়ো; মেজর জিয়া কিংবদন্তি, আর মেজর জেনারেল জিয়া সামরিক বাহিনীর একজন উচ্চ সেনাপতি মাত্র।

তিনি যে পরে এতো কিছু হয়েছেন, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, রাষ্ট্রপতি, একটি রাজবংশই প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন, তার মূলে আছে কালুরঘাট; এবং প্রাণ দিয়ে তিনি কিংবদন্তিটি প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। ট্র্যাজিক নায়কেরা স্মরণীয় হয়ে থাকে ট্র্যাজিক পতনের জন্যেই।

মেজর জিয়া এরশাদের মতো বিদুষক ছিলেন না; তাহলে এখনো তিনি বিদুষকের মতো বেঁচে থেকে কৌতুক যোগাতেন।

তিনি ছিলেন ট্র্যাজিক নায়ক, যদিও ক্ষুদ্র মাপের, গ্রিক নয় বাঙালির আকারের, একটি রঙ্গমঞ্চে যিনি হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন; তাঁর উত্থান ও পতন ট্র্যাজিক নায়কের মতোই, যদিও তাঁকে অনেকেই নায়ক মনে নাও করতে পারে। মনে করতে পারে তিনি ছিলেন ছোটোখাটো নায়কের মুখোশপরা, ছদ্মবেশী, মুখোশের ভেতরে ছিলেন ভিন্ন রকম, যা সবাই দেখতে পায় নি।

সারা ১৯৭১-এ যতো কিছু ঘটেছে, বিশ্বে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যতো সংবাদ পৌচেছে, যতো প্রচার হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারা যতো সেতু উড়িয়েছে, যতো পাকিস্তানি জন্তু বধ করেছে, যতো বাঙালি নিহত হয়েছে, যতো নারী লাঞ্ছিত হয়েছে, আর আমরা স্বাধীনতার যতো স্বপ্ন দেখেছি, তার সবটাই মুজিবের নামে। অন্য কোনো নামে এটা ঘটতে পারতো না; অন্য কোনো নাম থেকে এ-প্রেরণা উৎসারিত হতো না।

বাঙলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধে পৌছে দিয়েছিলেন মুজিব, বন্দী থেকেও তিনিই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন মুক্তিযুদ্ধকে, তিনিই সৃষ্টি ক'রে চলছিলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। মুজিবকে আমরা প্রচণ্ড সমালোচনা করতে পারি, তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে নন, অনেক সীমাবদ্ধতা তাঁর ছিলো; কয়েক দশক ধ'রে

তো কোটি কোটি বামন প্রাণভ'রে তাঁর সমালোচনা করছে।

কিন্তু সত্য হচ্ছে তিনি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, বাঙলাদেশের মহাস্থপতি।

মুজিব ছাড়া হাজার হাজার জিয়া বা অন্য কেউ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলেও মুক্তিযুদ্ধ ঘটতো না, তখন সেটা হতো হাস্যকর হঠকারিতা ও পরিণতিতে শোকাবহ; মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে আসতো না, এবং বিশ্ব আমাদের পক্ষ নিতো না, সাড়া দিতো না। এটা ঘটেছিলো মুজিবের জন্যেই। মুজিব বাঙলাদেশের স্থপতি, মহাস্থপতি; তিনি সৃষ্টি ক'রে চলছিলেন বাঙলাদেশ ; তাঁকে ছাড়া বাঙলাদেশের কথা ভাবাই যায় না। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিলো, সারা বিশ্ব আমাদের পক্ষে ছিলো; আমেরিকা, চীন, আর অন্ধকারযুগাচ্ছন্ন মুসলমান দেশগুলো ছাড়া– ওগুলো যে কখন একবিংশ শতকে আসবে; তখন বিশ্বের পরিস্থিতি ভিন্ন ছিলো– আজকের পরিস্থিতিতে যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধে যেতাম, তাহলে আমাদের হয়তো শোচনীয় পরিণতি মেনে নিতে হতো।

মার্কিন সরকার ছিলো পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু মানবিক মার্কিন জনগণ ছিলো আমাদের সঙ্গে, মার্কিন জনগণের চাপে মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে বিশেষ সাহায্য ক'রে উঠতে পারে নি; এবং মার্কিন গণতন্ত্র কতোটা উৎকৃষ্ট তার পরিচয় পাওয়া যায় ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডে, তাঁরা তাঁদের বিরূপ সরকারকে বারবার জানিয়েছেন যে পাকিস্তানকে সাহায্য করা ঠিক হবে না। একেই বলে গণতন্ত্র; সরকারের আদেশ, তাদের গুণ্ডাদের প্রতি বিনীত থাকা গণতন্ত্র নয়।

চীন তথাকথিত সাম্যবাদী, কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড সব সময়ই দুষ্ট, এবং দুষ্ট ছিলো বাঙালি চীনপন্থিদের ভূমিকাও– এখনো অনেকটা তাই আছে; আর চীনের জনগণের মতামত ব'লেই তো কিছু ছিলো না। চীনের মানুষের কথার কী মূল্য? তারা হচ্ছে নির্বাক সংখ্যা। তাদের কি অধিকার আছে কথা বলার? মুসলমান দেশগুলোর কথা ছেড়েই দিলাম। ওগুলো প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল, দুষ্ট,, ওদের বিশ্বাস রাজতন্ত্রে ও একনায়কত্বে, আব্বাসি ও উমাইয়া রাজারা এখনো অন্য বেশে আছে আরব দেশগুলোতে; গণতন্ত্র সেখানে দোজগের মতো। ওখানকার জনগণও মধ্যযুগীয়, আধুনিক যুগের কোনো আলো, সভ্যতার কোনো জ্যোতি ওখানে নেই, তাই তারা ছিলো পাকিস্তানের পক্ষে। আজো আরব অঞ্চল প'ড়ে আছে মধ্যযুগের শুরুর পর্বে; ওখানকার মানুষের কোনো মুক্তি ঘটে নি।

এসব প্রতিক্রিয়াশীলেরা ছাড়া সবাই ছিলো বাঙলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। অতিশয় সুসময়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলাম।

ছিলো ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য।

প্রধানত এ-তিনটি দেশ : এঁদের কাছে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ,

চিরপ্রীতির সম্পর্কে জড়িত থাকার কথা, তবে অস্থিমজ্জায় আমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে গেছি ব'লে আমরা কৃতজ্ঞ থাকি নি। এর জন্যে আমি গ্লানি বোধ করি, চারদিকে অকৃতজ্ঞদের উল্লাস দেখে মর্মাহত হই।

ভারত আশ্রয় দিয়েছিলো লাখ লাখ বাঙালি উদ্বাস্তুকে, তারা সবাই হিন্দু ছিলো না, মুসলমান বাঙালি উদ্বাস্তুর সংখ্যাই ছিলো বেশি। ভারতের স্বার্থ ছিলো? পকিস্তান ভেঙে দেয়ার স্বার্থ? তা হয়তো ছিলো; তবে আমাদের স্বার্থ ছিলো অনেক বেশি, আমাদের দরকার ছিলো স্বাধীনতা; আর পাকিস্তান ভেঙে যাওয়া কোনো বিস্ময়কর ঘটনা নয়, পাকিস্তান যে চব্বিশ বছর টিঁকে ছিলো, সেটাই বিস্ময়। পাকিস্তান নামের উদ্ভট দেশটির জন্মই হয়েছিলো ভেঙে যাওয়ার জন্যে, ওটিকে কখনো আমি নিজের দেশ ব'লে ভাবতে পারি নি।

তখন ইন্দিরা গান্ধি ছিলেন ভারতে, তিনি কাজ করেছিলেন মুজিবের বিকল্প সত্তারূপে। ইন্দিরার ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; পরে তিনিও তাঁর দেশে একননায়ক হয়ে উঠেছিলেন, ট্র্যাজিক পরিণতি বরণ করেছিলেন, কিন্তু আমরা ঋণী তাঁর কাছে।

আমি তাঁকে কখনো দেখি নি, বাঙলাদেশে যখন এসেছিলেন, তাঁকে দেখতে যাই নি; আমার অনেক বন্ধু, যারা ছাত্রজীবনে ছিলো আইউব-মোনেমপন্থি, মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব ও ইন্দিরার নাম তাদের মধ্যেও কতোটা যাদু সৃষ্টি করেছিলো, তা আমি দেখেছি।

মুজিব ও ইন্দিরার নাম নেয়ার সময় তারা এক ধরনের অতীন্দ্রিয় আবেগে কেঁপে উঠতো, তারা দেবতার ছোঁয়া পেতো। তারা হয়তো ছিলো স্বভাবতই পুজোরী; আইউব থেকে মুজিব-ইন্দিরার পুজোয় নিবেদিত হয়ে তারা ভিন্ন অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ পেতো, এটা দেখে আমি বিস্মিত হতাম। তবে এটা শুধু সাধারণদের মধ্যেই দেখেছি, তা নয়; পাকিস্তানপর্বে অনেক কবি 'কায়েদে আজম' নিয়ে শতো শতো পদ্য লিখেছেন, তাঁরাই আবার বাঙলাদেশপর্বে মুজিবকে নিয়ে মেতে উঠেছেন পদ্যে।

আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা ছিলো দিকে দিকে, ইন্দিরা পৃথিবীকে দীক্ষিত করছিলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে– শব্দটি সম্ভবত পৌত্তলিক হয়ে গেলো, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে কাজে লাগিয়েছিলেন বারবার। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে বারবার ভিটো দিয়েছে আমাদের পক্ষে, বিবিসি এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান সংবাদমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ ও মানবিকভাবে পক্ষ নিয়েছিলো আমাদের। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের কয়েক দিনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী, তাঁদেরও অনেকে জীবন দিয়েছিলেন আমাদের জন্যে; তাই তাঁরাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধা।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান জেনারেল অরোরা হয়ে

উঠেছিলেন আমাদের প্রিয় ব্যক্তি– জেনারেলরা যে প্রিয় হ'তে পারে তাই দেখিয়েছিলেন অরোরা, যাঁর নামের অর্থ মেরুপ্রভা, আর ঘৃণিত ছিলো নিয়াজি-ফরমান আলিরা। এখন বাঙলাদেশে ভারতবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল, কেননা পাকিস্তানের প্রেত চেপে আছে আমাদের ওপর, অশুভ প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রবল হয়ে উঠছে বাঙলাদেশে, ঘাতক শত্রুদের শয্যায় এখন আমরা পুলকিত প্রমোদ রাত্রি যাপন করছি।

আমাদের যেখানে কৃতজ্ঞ থাকার কথা ভারতের কাছে, ভারতের অধিবাসীদের ও সশস্ত্রবাহিনীর কাছে, তাঁদের প্রতি অনুরাগ বোধ করা যেখানে সততা, সেখানে আমরা কৃতঘ্নের ভূমিকা পালন করছি। এমন অকৃতজ্ঞতার ভার বহন করা কষ্টকর।

ভারতবিদ্বেষের কারণ হলো স্বাধীনতার পক্ষের পরাজয় ঘটেছে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি, যারা বহন করছে পাকিস্তানের উত্তরাধিকার। অত্যন্ত বেদনার বিষয় হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড়ো অংশ, যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, জীবন দিয়েছে, তারাও মানসিকতায় ছিলো পাকিস্তানবাদী; আর বাঙলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী পাকিস্তানি চেতনাই লালন করেছে– তাদের উচ্চপদস্থরা জীবনের শুরুতে পাঠ নিয়েছিলো পাকিস্তানবাদের, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ভারতবিদ্বেষ যার দুটি মূলস্তম্ভ। এ ছাড়া প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক ও পির-মওলানারা তো আছেই, যারা ইরানতুরানের স্বপ্নে বিভোর।

আমাদের প্রতিক্রিয়াশীলেরা এখন যাকে দণ্ডিত করতে চায়, তাকেই নিন্দিত করে 'ভারতপন্থি' ব'লে– পাকিস্তানের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীলদের ভারতবিদ্বেষধারা এখনো সমানে চলছে বাঙলাদেশে। 'ভারতপন্থি' নিন্দাসূচক নাম হয়ে উঠেছে, যদিও হওয়া উচিত ছিলো প্রশংসাসূচক; কেননা ভারতের থেকে কে আমাদের বেশি উপকার করেছে? জাতি হিশেবে আমরা শোচনীয় কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়ে চলছি। ভারতের সঙ্গে আমাদের আবহমান ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে; মিল রয়েছে ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, জীবনধারণপদ্ধতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, নদী, মেঘ, সঙ্গীত, হাহাকার, সুখ, বৈশাখ ও ফাল্গুনের মধ্যে।

ভারতের সঙ্গে যারা সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক, ভাষিক, ও আরো অজস্র বিষয়ে আন্তর সম্পর্ক বোধ করে, তারা বাঙলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিতে চায় না, তারা স্বাধীন বাঙলাদেশই চায়; তবে তারা বহু বিষয়ে গভীর সম্পর্ক বোধ করে ভারতের সঙ্গে, কেননা তারা এটা তাদের রক্তে অনুভব করে। আমি কখনো ভারতীয় হ'তে চাই না, ভারতের আজ্ঞাও মেনে চলতে চাই না, কিন্তু আন্তরিক সম্পর্ক পাতাতে আমার কোনো দ্বিধা নেই; আমি কী ক'রে পরিত্যাগ করবো পাণিনি, ব্যাস, বাল্মীকি, চার্বাক, কালিদাস,

কাহ্নপাদ, চণ্ডীদাস, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথকে, এবং আরো অনেককে? কালো মাটির দেশের মিশরিরা মুসলমান হয়েছে, তারা আলেকজান্দ্রিয়ার মহাগ্রন্থাগার ধ্বংস করেছে, আল আজহার তৈরি ক'রে অন্ধকারে থাকছে, কিন্তু ফারাওদের পিরামিড এখনো তাদের প্রধান সম্পদ ও ঐতিহ্য। এছাড়া আর কী আছে তাদের?

ভারতের রয়েছে মহান ঐতিহ্য, যার অংশী আমরাও।

এ-মিল আমাদের নেই পাকিস্তান, আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, কাতার, দুবাই, সৌদি আরব, মিশর, ইয়েমেনের সঙ্গে; এদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে শুধু ধর্মে। আরবরা তো আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত, এখনো ওরা উগ্র যাযাবর, যাদের কাজই ছিলো গোত্রে গোত্রে হানাহানি করা, এখনো গোত্রীয় হানাহানি থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে নি; আরবদের সঙ্গে একটু বসলেই বোঝা যায় তারা কতো উগ্র, হঠাৎ ধনে অহমিকাপরায়ণ, অসংস্কৃত, আদিম, অশ্লীল, বর্বর, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ও প্রতিক্রিয়াশীল। ধর্ম ও সম্ভোগ– নারী ও মদ্য, যদিও এটি নিষিদ্ধ– ছাড়া তারা সাধারণত আর কিছু বোঝে না, জ্ঞান ও শিল্পকলা, সৃষ্টিশীলতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা তাদের শত্রু।

আরবদের থেকে খারাপ মানুষ আমি খুবই কম দেখেছি।

তাই সেখানেই পাঠাতে হয় প্রেরিতপুরুষ।

নিউ ইয়র্কে এক বাঙালি তরণের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো রাস্তায়। সে শিককাবাব বেচে ম্যানহ্যাটানের টানেল স্ট্রিটে। সাত বছর সে এক আরব দেশে ছিলো, তার মতে দোজগে ছিলো, আর নিউ ইয়র্কে সে আছে বেহেশতে। আরব আর আমেরিকার মধ্যে বেহেশত-দোগজের পার্থক্য।

ধর্মের ক্ষেত্রেও তারা খুবই কপট, যান্ত্রিকভাবে তারা নামাজ আদায় করে, এর বেশি কিছু করে না; একসঙ্গে অনেকগুলো স্ত্রী রাখে, দাসীও রাখে অনেকগুলো, যাদের তারা সম্ভোগ করে পিতা ও পুত্ররা মিলে। বাঙলাদেশ, শ্রীলংকা, ফিলিপাইনসের অনেক পরিচারিকা সেখানে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সম্মিলিত ধর্ষণের। একজন খাঁটি বাঙালি মুসলমান যতোটা ধার্মিক একজন খাঁটি সৌদি মুসলমান ততোটা ধার্মিক নয়, যদিও তাদেরই আমরা মনে করি ইসলামের বাহক।

মুসলমান দেশগুলোতে, বিশেষ ক'রে আরব দেশগুলোতে, আধুনিক চেতনা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ব'লে কিছু নেই। সেখানে আছে রাজাবাদশা, একনায়ক, যুবরাজ। সৌদি আরবের সমস্ত বড়ো পদে আছে হাজার রাজপুত্র, সেখানে রাজপুত্রের অভাব নেই; একেক রাজপুত্রের অসংখ্য বিবি ও উপবিবি, আর তাদের বিবিরা বছর বছর রাজপুত্র প্রসব করে। আমাদের এখানকার যারাই কাজ করেছে আরবাঞ্চলে, তারাই তীব্র

ঘৃণা নিয়ে ফিরে এসেছে; কেননা ওই মুসলমানদের কাছে তারা মানুষের মূল্যও পায় নি, মুসলমানের মূল্যও পায় নি।

আমাদের যতোটা মিল আছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও অন্য বহু কিছুর সঙ্গে, আছে যতোটা নৈকট্য, ততোটা আর কারো সঙ্গে নেই।

রাজনীতিক ভারতবিদ্বেষ প্রবল হ'লেও– হয়তো এটা কপটতা– দেশ জুড়েই তো দেখি ভারতকে। পথে বেরোলেই ভারতীয় টাটা সুজুকি, বাজারে গেলেই ভারতীয় চাল ডাল পেঁয়াজ রসুন আচার মরিচ, পুণ্য অর্জন করতে গেলেই দেখি ভারতীয় গোমাতাকে, বৃক্ক হৃদপিণ্ড ঠিক করতে গেলেই ছুটছি দিল্লি চেন্নাইয়ে, আর দিনরাত প্রমোদে মেতে আছি ভারতীয় ঔপগ্রহিক প্রচণ্ড নৃত্য ও গীতে– প'ড়ে আছি তরুণীদের দেহের বাঁকে। ধার্মিকেরাও ওই তরুণীদের দেহের ডাকে নিরন্তর কাঁপছে।

আমরা বাস করছি প্রচণ্ড রাজনীতিক ভণ্ডামোর মধ্যে; মুখে ভারতবিদ্বেষ আর পেটের ভেতরে, মাংসের ভেতরে, ভারত।

এশীয় মুসলমান একনায়কেরা, কখনো কখনো তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে (অনেক সময়ই তারা ৯০% থেকে ১০০% টি ভোট পায়, একলাই নির্বাচনে দাঁড়ায়, হ্যাঁ/না দিয়ে ভোট করে; যেমন এবার সাদ্দাম ১০০% ভোট পেয়েছে, ১০০% ভোটার ভোট দিতে গেছে; এতেই বোঝা যায় কতোটা মৃত্যুর ভয়ের মধ্যে তারা বাস করে; আমেরিকা-ইউরোপে ৫০% জনও ভোট দিতে যায় না, ভোট দেয়ার অধিকার যেমন আছে তাদের, তেমনি আছে না দেয়ার অধিকার) ক্ষমতায় এলেও তারা স্বৈরাচারী একনায়কই থেকে যায়,– তারা গণতান্ত্রিক প্রধান মন্ত্রী হয়ে ওঠে না, তারা হয় দেশের স্বেচ্ছাচারী বিধাতা।

তাদের এবং তাদের স্বার্থভোগী স্তাবকদের মুখে মাঝেমাঝে একটি কথা শোনা যায় যে, 'পাশ্চাত্য মূল্যবোধ আমাদের এখানে চলে না', পশ্চিমের সঙ্গে একটু ঠোকাঠুকি হ'লেই বলে, 'পশ্চিম তাদের মূল্যবোধ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, এটা আমরা মানতে পারি না।' এসব শুনতে বেশ লাগে– মাঝেমাঝে বমিও আসে, যেনো আমাদের আছে খুবই উৎকৃষ্ট মূল্যবোধ, যা পশ্চিমের মূল্যবোধের থেকে মহত্তর।

মালয়েশিয়ায় মিল হচ্ছিলো না একনায়ক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে উপপ্রধান মন্ত্রীর, প্রধান মন্ত্রী তার এক সময়ের প্রিয় লোকটিকে 'সমকামী' ঘোষণা ক'রে, কুকুরটিকে খুন করার জন্যে একটি কুনাম দিয়ে, কারাগারে ঢুকিয়ে দিলো; তার আর বেরোনোর উপায় রইলো না। এই হলো প্রাচ্যের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। আমাদের এখানে কি কোনো প্রকৃত মূল্যবোধ আছে? আমরা তা সৃষ্টি করেছি?

আমাদের মূল্যবোধ তো উৎপীড়ন, শোষণ, ক্ষমতাদখল, জমিদখল,

নদীদখল, ঘুষ, দুর্নীতি, লুণ্ঠন, অন্যায়, অনাচার, মিথ্যাচার, দাপট, মানুষের অধিকার ছিনতাই।

আমরা কি প্রকৃতপক্ষে কোনো মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছি, যেমন করেছে পশ্চিম?

পশ্চিম হচ্ছে ভবিষ্যৎমুখি, মুক্তির মণ্ডল; তারা দশকে দশকে বছরে বছরে এগিয়ে যায় সামনের দিকে– সমস্ত এলাকায়, এবং মানুষকে মুক্ত করার সূত্র তারাই বের ক'রে চলেছে কয়েক শতক ধ'রে। স্বাধীনতার কথাও তারাই আমাদের শিখিয়েছিলো। আমরা অতীতমুখি, মানুষকে বন্দী ক'রে রাখাতেই আমাদের সুখ। পশ্চিম মানুষকে যে-অধিকার দিয়েছে, আমরা কি তা দিয়েছি?

মানবাধিকারের কথাও আমরা শুনেছি পশ্চিমের কাছেই।

তারা মানুষকে যেমন মানুষ মনে করে, আমরা কি তা করি? পশুকেও তারা যে মূল্য দেয়, আমরা কি তা দিই মানুষকে? একটি বেড়াল গাড়িচাপা পড়লেও তারা সেটিকে নিয়ে হাসপাতালে ছোটে, আর আমরা মানুষকে চাপা দিয়ে উল্লাসে পালিয়ে যাই। এই আমাদের মহান প্রাচ্যদেশীয় মূল্যবোধ। রোমান একনায়কেরা ঈর্ষা করতো প্রাচ্য একনায়কদের; তারা বলতো, আমাদের এতো ক্ষমতা, যা ইচ্ছে করতে পারি, কিন্তু প্রাচ্য একনায়কদের পাশে আমরা তুচ্ছ, ওরা যার তার গলা কাটতে পারে, আমরা পারি না। পশ্চিম মানুষকে মূল্য দিতে চেষ্টা করেছে পীড়নের মধ্যেও, আর আমরা আদরের মধ্যেও মানুষকে মূল্য দিই না।

আমাদের এখনকার একনায়কেরা– তারা হয়তো তথাকথিতভাবে নির্বাচিত– যা করতে পারে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তা সম্ভব নয়; এমনকি আমাদের একটি দারোগা বা সচিব নিয়মিতভাবে ক্ষমতার যে-অপব্যবহার করে, তা মার্কিন রাষ্ট্রপতির পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দারোগারাও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির থেকে শক্তিমান; তাদের দাঁড়ানোর, বসার, হাঁটার ভঙ্গি দেখলেই তা বোঝা যায়। ওই ভদ্রলোক বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু একটি মার্কিন নাগরিককে পীড়ন করতে পারেন না, বা একটি ডলারও অবৈধভাবে নিতে পারেন না রাষ্ট্রকোষ থেকে। আর আমাদের শক্তিমানেরা?

তারা সর্বশক্তিমান। তারা বিধাতা। তারা যা ইচ্ছে তা করতে পারে, খুন করতে পারে, অবৈধ অর্থে ফেঁপে উঠতে পারে, তাদের আত্মীয়স্বজনেরা অঞ্চলে অঞ্চলে প্রভু হয়ে উঠতে পারে, এবং ওঠে, কিন্তু আমাদের বলার কিছু নেই, আমরা পারি শুধু অসহায়ভাবে তাদের মহান শক্তির ক্রিয়া উপভোগ করতে। তারা কর্তা, তারা ক্রিয়া করে; আমরা কর্ম, আমরা তাদের কর্মের ফল ভোগ করি। এই হচ্ছে আমাদের মূল্যবোধ।

একটি ঘটনার কথা আমি ভুলতে পারি না।

১৯৭৪-এ পাশাপাশি ব'সে টেলিভিশনে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখছিলাম আমি আর ইয়োগোশ্লাভিয়ার আমার এক বন্ধু। সে মহাএকনায়ক, বুকভরা তারকাখচিত, টিটোর দেশের মানুষ; সে জানতো একনায়কত্ব কাকে বলে। খেলা হচ্ছিলো জার্মানিতে। সেদিন ইংল্যান্ড দল খেলছিলো ব'লে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলসনও খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। খেলায় ইংল্যান্ড দল হেরে যায়। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী খেলার শেষে– ঘটনাটি সরাসরি দেখানো হচ্ছিলো টেলিভিশনে– ইংল্যান্ড দলের ব্যবস্থাপককে একটি পরামর্শ দেন; তার উত্তরে ব্যবস্থাপক বলেন, 'মিস্টার প্রধান মন্ত্রী, আপনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে আপনার নিজের কাজ করুন।' কথাটি শুনে ভয় পেয়ে আমার ইয়োগোশ্লাভ বন্ধুটি চেয়ার থেকে প্রায় মেঝেতে প'ড়ে যায়, আর বলতে থাকে, 'আমার দেশে একথা একটা ছোট্ট নেতাকে বললেও ব্যবস্থাপকটিকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না।'

ওই মহাএকনায়ক ও তাঁর মহাদস্যুরা ধ্বংস হয়ে গেছে; দেশটিকেও ধ্বংস, খানখান, ক'রে গেছে।

আমাদের অবস্থাও কি একই রকম নয়? আমরাও কি একটি পাঁতি নেতাকে এমন কথা ব'লে নিশ্বাস নেয়ার অধিকার রাখি?

আমাদের নেতারা তো মহাশক্তিমান, বিধাতা তাদের শক্তিমান করেছে।

আমি যখন এ-বইটি লিখছি, কারো কারো সঙ্গে কথা বলছি, তাঁরা ভয়ে কেঁপে আমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, 'সাবধান! জিয়া, খালেদা জিয়া, তারেক, আর বিএনপি সম্পর্কে কোনো কড়া কথা লিখবেন না, সাবধান।' তাঁদের চোখেমুখের আতঙ্ক দেখেই বুঝতে পারি আমরা কী ভয়ানক গণতন্ত্রে বাস করছি।

জনগণ ভয়ানক 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' দেখেছে, যাতে পিষে ফেলা হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে, খুন করা হয়েছে ৪০ জনেরও বেশিকে– খুনীদের জন্যে পাশ করা হয়েছে 'দায়মুক্তি'র আইন। খুনীরা এদেশে সব সময়ই 'দায়মুক্ত'। জনগণ দেখেছে লেখক ও সাংবাদিকদের অবস্থা, দেখেছে শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন, সালিম সামাদ, এনামুল হক চৌধুরী, প্রিসিলা রাজ ও আরো অনেকের ওপর তালেবান গণতন্ত্রের সক্রিয় কর্মকাণ্ডের রীতিপদ্ধতি। তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠেছেন।

কিছু লেখা যাবে না? ছবিও তোলা যাবে না?

সমস্ত স্থির ক্যামেরা ও ভিডিয়ো ক্যামেরাগুলো দিয়ে তুলতে হবে শুধু প্রসাধিত প্রধান মন্ত্রী আর সুসজ্জিত মন্ত্রীদের ছবি?

আর সেগুলো প্রচার করতে হবে সব টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে?

জনগণ দেখতে পাবে কী সুন্দর– রঙিন– আছে দেশ।

সারাদেশই তো তাদের সম্পত্তি, রাষ্ট্রের সব টাকাই তো তাদের টাকা। প্রতিটি ব্যাংকই তাদের ব্যাংক, মন্ত্রীসভা হচ্ছে তাদের পরিবারসভা। তারা যা বলে তাই আইন; আন্তোনি সিজারকে বলেছিলো, 'সিজার যখন কিছু বলেন, বলার আগেই তা প্রতিপালিত হয়'; আমাদের এখানে কোনো সিজার নেই, সবাই তুচ্ছ, অতিশয় তুচ্ছ, কিন্তু তাদের কথাও বলতে হয় না, তাদের মুখ দেখেই তাদের বাসনা প্রতিপালিত হয়। তাই প্রাচ্যের– আমাদের– মূল্যবোধ নিয়ে গৌরব করার কিছু নেই, ওগুলোর অধিকাংশই মানুষের জন্যে ক্ষতিকর; ওগুলো থেকে মুক্তিই মঙ্গল।

প্রকৃত মূল্যবোধ যা কিছু আমরা পেয়েছি, তা সবই পশ্চিম থেকে। শব্দটিও অনুবাদ ক'রে পেয়েছি পশ্চিম থেকে– আমরা এখন যতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণা মগজে বই, তার সবটাই পশ্চিমের কাছে পেয়েছি; আমাদের আছে আদবকায়দা, সালামআদাব, পশ্চিমের আছে মূল্যবোধ।

মূল্যবোধ বলতে আমরা কী বুঝি?

বুড়োদের সালামআদাব দেয়া, প্রভুদের তোষামোদ করা, নামাজের নামে কাজ ফাঁকি দেয়া, ওপরালাকে 'স্যার, স্যার, হুজুর, হুজুর' করা, রেডিও-টেলিভিশনে আজান দেয়া, ওয়াজ করা ও ধর্মের নামে নানা বাজেকথা বলা, প্রস্রাবের পর প্রকাশ্যে কুলুপ নিয়ে কদম কদম হেঁটে পরিস্থিতিকে পবিত্র করা, ছেলেমেয়েদের একসাথে বসতে না দেয়া, প্রেম করতে না দেয়া, চুমো খেলে গ্রেফতার করা।

তবে প্রকাশ্যে খুন করা আমাদের মূল্যবোধের পরিপন্থি নয়, প্রকাশ্যে রাস্তায় কেউ কাউকে খুন করলে– যা এখন প্রাত্যহিক জাতীয় কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে– সেটাকে আমরা মূল্যবোধের অবক্ষয় মনে করি না, চুমো খেলে সেটাকে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় মনে করি; ঘুষ খাওয়াও আমাদের উন্নত মূল্যবোধের অঙ্গ, এটাকে কেউ আমরা খারাপ মনে করি না, আমাদের প্রবল ধর্মবোধের সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই, বরং যে যতো ঘুষ খেতে পারে তাকে আমরা ততো মর্যাদা দিই।

আমাদের মূল্যবোধ হচ্ছে রাস্তার পাশে প্রস্রাব ক'রে কুলুপ নিয়ে গর্বের সঙ্গে চল্লিশ কদম হাঁটা, যেখানেসেখানে হোটেলে বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করা যে কেউ জেনা করছে কি না, কেউ মদ খাচ্ছে কি না, যদিও শক্তিমানেরা এসব নিয়মিত করে, কারণ তারা যা করে তা হচ্ছে দেবতাদের লীলাখেলা, শক্তিহীনেরা করলে তা মূল্যবোধের অবক্ষয়।

নিরর্থক, ভণ্ডামোতে ভরা, আমাদের মূল্যবোধ, যা শুধু ঘেন্না জাগায়। যা কিছু ভালো, মানবিক, তার সবই আমরা পেয়েছি পশ্চিম থেকে; আমি আজ পর্যন্ত পুবে এক টুকরো নৈতিকভাবে ভালো জিনিশ খুঁজে পাই নি। মাতৃভক্তি, পিতামাতার পদতলে স্বর্গ? এগুলো নিরর্থক বাজেকথা, বুলিমাত্র;

পিতামাতারা আমাদের দেশে যতোটা অভক্তি পায়, পশ্চিমে তা পায় না, কেননা ভক্তির কোনো দরকারই নেই স্বাধীন মানবাধিকারপূর্ণ সমাজে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, যুক্তি, মানবাধিকার, স্বাধীনতা, এবং এমন হাজারো বোধ আমরা পেয়েছি পশ্চিম থেকে, আমাদের বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ'ড়েই উঠতো না যদি না পশ্চিম এটা শেখাতো। তবে নিরর্থক অতীতের বন্দনা করা আমাদের ব্যাধি, নানা তুচ্ছ উদাহরণ আমরা দিয়ে থাকি।

এখানে একদা নালন্দা ছিলো? কী জ্ঞান সেখানে অর্জিত হতো? নির্বাণলাভের বিজ্ঞান? জন্মের শৃঙ্খলমোচনের পদ্ধতি? ওটা কোনো জ্ঞান? প্রকৃত মানবিক মূল্যবোধগুলো আমাদের প্রভুরা মেনে নিতে চায় না, তাহলে তাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতার সুযোগ থাকে না; তারা চায় পশ্চিমের যন্ত্রপাতি, বিলাসসামগ্রি, তাও সকলের জন্যে নয়, নিজেদের জন্যে, কিন্তু তারা পশ্চিমের মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক চেতনাকে ভয় করে।

উনিশশতকের এক ব্রাহ্মণ তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলো, পুত্র, অদ্য বিদ্যালয়ে কী জ্ঞান অর্জন করিলে? পুত্র বলেছিলো, পিতা, অদ্য শিখিয়াছি যে বায়ুর ওজন আছে। ব্রাহ্মণ মুগ্ধ হয়ে বলেছিলো, পুত্র, তুমি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিয়াছ, এতকাল আমরা মনে করিয়াছি বায়ুর ওজন নাই, আমরা ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে রহিয়াছিলাম।

আমাদের কোটি কোটি ভ্রান্ত ধারণা কেটেছে পশ্চিমের জ্ঞানের ফলে, যদিও আমরা আজো ভ্রান্তির মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছি।

স্বাধীনতা আমাদের জন্যে ছিলো যুগান্তর; স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা পাকিস্তানি মধ্যযুগ থেকে আধুনিক মানবিক যুগে উত্তীর্ণ হ'তে চেয়েছিলাম, অন্তত তাই আমরা মনে করেছিলাম।

১৯৭২-এর ১২ অক্টোবরে জাতীয় সংসদে বাঙলাদেশের অসাধারণ সংবিধানটির খসড়া উত্থাপিত হয়, ১৪ ডিসেম্বরে এটি গৃহীত হয়, এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর হয়।

সংবিধানে স্থান পেয়েছিলো রাষ্ট্রপরিচালনার চারটি মূলনীতি : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতা। স্বাধীনতা আমাদের এনে দিয়েছিলো মুক্তির স্বাদ ও উল্লাস, এ-নীতিগুলো তা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। যাঁরা এটি রচনা করেছিলেন, তাঁরা হঠাৎ মহত্ত্বের বোধ দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; কিন্তু এখানে, যেমন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেছিলেন, 'প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাত', তাঁরাও তাঁদের ওই মহৎ প্রেরণা বেশি সময় ধারণ করতে পারেন নি।

সাধারণেরা আবার সাধারণ হয়ে উঠেছিলেন।

পাকিস্তানে দেখে এসেছিলাম স্বৈরতন্ত্রের পর স্বৈরতন্ত্র, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুচকাওয়াজ, খটখটে বুটের আওয়াজ, লেফ্‌ট্‌-রাইট, সামরিক

একনায়কপরম্পরা, উর্দিতন্ত্র, আর তার প্রিয় ধর্মতন্ত্র; গণতন্ত্র কখনো দেখি নি, যা দেখেছিলাম তার নাম 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র', যার মূলকথা ছিলো সামরিক একনায়কের বুটের স্তবগান করা। পাকিস্তান ও গণতন্ত্র পরস্পরবিরোধী ধারণা; একটি থাকলে আরেকটি থাকতে পারে না, তাই সেখানে গণতন্ত্র ছিলো না, আর পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র তো ছিলো শুয়োরগোস্তের মতো হারাম, জেনার মতো কবিরা গুনা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কি আমরা এ-চারটি নীতির কথা– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ভেবেছিলাম? এগুলোকে মূলমন্ত্র ক'রে আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিলাম? মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে; সব পরিকল্পনা ক'রে, নীতি ও অস্ত্রশস্ত্র গোছগাছ ক'রে আমরা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করি নি; স্বাধীনতাই ছিলো আমাদের একমাত্র লক্ষ্য; এবং মনে করেছিলাম স্বাধীনতা পেলে উৎকৃষ্ট সব কিছু পাবো।

বাঙলাদেশের সংবিধানটি প্রণীত হয়েছিলো বাঙলায়, এটিও একটি যুগান্তকারী ঘটনা; এর একটি ইংরেজিরূপও ছিলো এবং বলা হয়েছিলো দুটি রূপের মধ্যে অমিল দেখা দিলে বাঙলারূপটিই প্রাধান্য পাবে।

এর নীতি চারটি ছিলো একটি আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী মূলনীতি। আমরা এমন একটি রাষ্ট্রই চেয়েছিলাম, যা পাকিস্তান থেকে, ইরানতুরান থেকে, মধ্যযুগ থেকে অনেক সুদূর : আধুনিক।

গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র যদিও পরস্পরবিরূপ, তবুও আমরা ভেবেছিলাম এ-দুটির সমন্বয় ঘটবে বাঙলাদেশে; আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা যেমন থাকবে, তেমনি আমাদের অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক, তাতে সব মানুষের জীবিকা নিশ্চিত হবে, সাধারণ মানুষ শোষিত হবে না, একদল পুঁজিপতি দেশটিকে লুটে খাবে না। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ভীতিকর ছিলো না কারো কাছে, শুনতে শুনতে এ-দুটিকে সবাই কোনো সুখাদ্য ব'লেই মনে করতো; এমনকি গণতন্ত্রের সমাজতন্ত্রের শত্রু একনায়কেরাও তখন এ-দুটির গুণ গাইতো।

ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটিই ছিলো অভিনব ও ভীতিকর।

আগে এর কথা শোনা যায় নি। মুসলমান, যদিও বাঙালি, যাদের মানসিক ও শিক্ষাগত উন্নতি বিশেষ ঘটে নি, যারা এক সময় 'আল্লাহু আকবর', 'নারায়ে তকবির'-এ মেতে উঠতো, এক মুক্তিযুদ্ধেই তারা হয়ে উঠবে ধর্মনিরপেক্ষ? আমি শুনেছি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে এসে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, আক্রমণের সময় তাঁরা 'ইয়া আলি, ইয়া আলি', 'আল্লাহু আকবর' ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

অনেকের কাছে এ-নীতিটিই ছিলো ভীতিকর; সংবিধানপ্রণেতারাও অনেকে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, সংবিধানে এটি রাখার সময় তাঁরা

অনেকেই হয়তো দোজগের ভয়ে কাঁপছিলেন, তাই অবিলম্বেই ভয় পেয়ে তাঁরা বলতে শুরু করেছিলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়', এবং নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করেছিলেন।

ভয় ঢুকে গিয়েছিলো তাঁদের ভেতরেই, ধর্মহীনভাবে বেঁচে থাকা কঠিন, না খেয়ে বেঁচে থাকা সহজ; আর যতোই বাঙালিত্বের কথা তাঁরা বলুন না কেনো ভেতরে ভেতরে আসলে তো ছিলেন মুসলমান। তবু বাঙালি জাতীয়তাবাদ তখন আমাদের রক্তে ঢুকে গেছে, অনেকের কাছে এটিই হয়ে উঠেছিলো প্রধান পরিচয় ও সুস্থ শরীরে রক্তসঞ্চালনের মতো স্বাভাবিক। এটা উগ্র জাতীয়তাবাদের সময় নয়, আমরা বাঙালি, এটা সব সময় চিৎকার ক'রে বলারও দরকার নেই, এটা তো গভীর সত্য; এ-সত্যটি স্থান পেয়েছিলো সংবিধানে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা এক ছিলাম, কিন্তু স্বাধীনতার পরপরই দেখতে পাই আমরা বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছি, বিরোধ দেখা দিচ্ছে। আমরা শুধু বিভিন্ন হয়ে যাচ্ছিলাম না, আমরা বিভিন্ন প্রতিপক্ষে পরিণত হচ্ছিলাম।

স্বাধীনতার কয়েক দিনের মধ্যেই দুটি ব্যাপার আমাকেও বেশ পীড়া দিয়েছিলো : একটি হলো 'হাজি' ও 'রাজাকার'দের বিরোধ, আরেকটি দিকে দিকে লুঠতরাজ। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে আমরা মুগ্ধ ছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের বিস্ময়কর মুখাবয়ব ও উর্দি দেখে; তাদের দীর্ঘচুল আর বিস্রস্ত দাড়িগোঁফ আমাদের কাছে পতাকার মতো মনে হচ্ছিলো, তাদের হাতের উদ্যত রাইফেলকে মনে হচ্ছিলো স্বাধীনতার বাঁশরি।

বাঙালি তরুণদের এমন রূপ কখনো আগে দেখি নি, তারা বিস্ময়কর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিলো আমাদের চোখের সামনে। চে আর কাস্ত্রো ষাটের দশকে আমাদের কাছে যে-রোম্যান্টিক নায়কের রূপে দেখা দিয়েছিলো, একাত্তরের ডিসেম্বরের পর হাজার হাজার চে ও কাস্ত্রোকে আমাদের মধ্যে দেখে আমরা শিউরে উঠেছিলাম। তখন কি জানতাম এদের অনেকেই ছদ্ম চে ও কাস্ত্রো?

কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই বিরোধ ঘনিয়ে ওঠে, আমাদের চোখ থেকে অনেক স্বপ্ন বিলীন হয়ে যেতে থাকে, স্বপ্নের স্থান দখল করতে থাকে দুঃস্বপ্ন, এবং অনেক নিন্দাসূচক শব্দ তৈরি হয়ে যেতে থাকে। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে 'হাজি', 'খলিফা', আর 'সিক্সটিন্থ ডিভিশন'। 'রাজাকার' শব্দটি তো আগে থেকেই ছিলো, কিন্তু তারও অপব্যবহার শুরু হয়। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন যে বেশি নৈতিকতাবাচক শব্দেরই পতন ঘটে বেশি; আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পর তাঁদের তত্ত্ব অনেকটা নতুনভাবে প্রমাণিত হয়। যারা হজ করে তারা হাজি; কিন্তু এ-শব্দটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হ'তে থাকে কলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ফিরে আসা শক্তিমান উদ্বাস্তুদের

সম্পর্কে। কেনো এমন হয়েছিলো?

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা সবাই ত্রিপুরা বা পশ্চিম বঙ্গে যাই নি, যেতে পারি নি, যাওয়া সম্ভব ছিলো না; গেলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না। গিয়েছিলো অনেকে : তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলো অসহায় মানুষ, কোনো কৃতিত্ব অর্জনের ভাগ্য যাদের নেই, বেঁচে থাকাই যাদের জীবনের একমাত্র সফলতা, তাতেও তারা সাধারণত সফল হয় না; কিন্তু গিয়েছিলেন অনেক শক্তিমান। ওই শক্তিমানদের কাউকে কাউকে আমি চিনি, যাঁদের কথা ছিলো রাজাকার হওয়ার, কিন্তু পরিস্থিতি তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা ক'রে তুলেছিলো, তারা পরে তার সুফল তুলেছিলো প্রাণপণে।

ফিরে এসে তাঁরা এমন আচরণ করতে থাকেন যে দেশে যারা ছিলো, তারা সবাই 'রাজাকার'; এবং তাঁদের উদ্ধত আচরণে অধিকাংশ বাঙালি মর্মাহত হয়। এটা ছিলো দেশে থেকে যাওয়া বাঙালিদের জন্যে এক চরম বেদনার ব্যাপার। ফিরে এসে তাঁরা নানা আকর্ষণীয় পদ ও সম্পদ অধিকার করতে থাকেন, যেনো দেশের সব কিছুই তাঁদের প্রাপ্য, কিন্তু দিন দিন প্রবাসে তাঁদের কীর্তিকলাপের কাহিনী ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তাঁদের জন্যে একটি নিন্দাসূচক অভিধা উদ্ভাবিত, জনপ্রিয়, ও প্রচারিত হয়ে যায়, সেটি হচ্ছে 'হাজি', তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা নন, 'হাজি'।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই রাজাকার হয়েছিলো, প্রচণ্ড অত্যাচারও করেছিলো, কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিলো খুবই কম– এখন দেশে যতো রাজাকার আছে তখন ততো রাজাকার ছিলো না,– তখন অধিকাংশ বাঙালিই ছিলো সশস্ত্র বা নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। রাজাকারদের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে গত তিন দশকে; এবং বেদনাদায়ক ব্যাপার হচ্ছে স্বাধীনতার পর, তিন দশকে, মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধকে ভুলে দীক্ষা নিয়েছে রাজাকারমন্ত্রে।

কলকাতা থেকে ফেরা 'হাজি'রা যখন প্রায় সবাইকেই 'রাজাকার' ব'লে মর্মাহত ক'রে চলছিলো, তখন একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক– *হলিডে*– প্রথম পাতা জুড়ে একটি মারাত্মক প্রতিবেদন প্রকাশ করে, বিশাল অক্ষরে যার শিরোনাম দেয়া হয়েছিলো 'সেভেনটি ফাইভ মিলিয়ন কোলাবোরেটরস'। একটি প্রতিবেদনই দেশ থমকে গিয়েছিলো; সাড়ে সাত কোটি বাঙালি সবাই রাজাকার? যারা কলকাতা গিয়েছিলো তাঁরাই শুধু মুক্তিযোদ্ধা? হাজিরা ঘা খেয়ে সংযত হয়েছিলো, তবে পুরোপুরি হয় নি। *হলিডে* অবশ্য পরে নানা অপকর্ম করেছে, তবে ওটি ছিলো পত্রিকাটির শ্রেষ্ঠ কাজ।

আরেকটি নিন্দাসূচক নাম চালু হয়ে যায় অনতিবিলম্বে– 'চার খলিফা'। একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের দেশে ইসলামের শ্রদ্ধেয় শব্দগুলো কালে কালে হয়ে উঠেছে নিন্দাসূচক বা ব্যঙ্গাত্মক– যেমন 'পির', 'ফাজিল', 'ফেরেশতা', 'মোল্লা', 'মাস্তান' এবং আরো অনেক।

এই চার ছাত্রনেতা ছাত্র হিশেবে ছিলো খুবই নিকৃষ্ট।

একটি নেতা নিয়মিতভাবে বাঙলা বিভাগে এসে জ্বালাতন করতো একটি অপূর্ব সুন্দরী বিবাহিত তরুণীকে। ওই নেতাটি এখন মহাকালের গ্রাসে, আর অপূর্ব সুন্দরীটি কতোটা রূপ নিয়ে কোথায় আছে জানি না।

চারটি ছাত্রনেতা, যারা উত্তেজক ভূমিকা পালন করেছিলো ১৯৭১-এর মার্চে, স্বাধীনতার পর তারা হয়ে ওঠে নিন্দিত; দেশে ফিরে তারা দেখাতে থাকে প্রচণ্ড মাতবরি, ত্রাস সৃষ্টি করতে থাকে, লুঠ করতে থাকে ধনসম্পদ, দখল করতে থাকে বাড়িঘর; এটা জনগণ ভালো চোখে দেখে নি। তাদের নিন্দা করার জন্যে স্বতস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়ে যায় 'চার খলিফা' অভিধা। স্বাধীনতার পর তাদের ভূমিকা ছিলো খুবই খারাপ, এখন পর্যন্ত তাদের কেউ কেউ অত্যন্ত নষ্ট ভূমিকা পালন ক'রে চলছে।

দেশকে তারা সীমাহীনভাবে বিপর্যস্ত করেছে।

এ-ধরনের হাজি ও খলিফারা, তখন র'টে গিয়েছিলো, টাকার বিনিময়ে আশ্রয় দিয়েছিলো অনেক রাজাকার ও আলবদরকে। কথাটি হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়। আরেকটি নিন্দাসূচক অভিধা ছিলো 'সিক্সটিন্থ ডিভিশন' বা নকল মুক্তিযোদ্ধা, ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা ছিলো অন্য কাজে, কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরে দেখা দেয় মুক্তিযোদ্ধারূপে। এরাই শুরু করে লুঠতরাজ; পরিত্যক্ত বাড়িঘর দখল করতে থাকে, বিভিন্ন কারখানার প্রশাসক হয়ে ওঠে, বিক্রি ক'রে দিতে থাকে সব কিছু।

আর ছিলো মুক্তিযুদ্ধ ক'রে বা না ক'রে ফিরে আসা ধূর্ত নেকড়ে আমলারা। আমলারা চিরকালই সুবিধাবাদী, বিদ্রোহে ও চক্রান্তে তারা সব সময়ই মনে রাখে নিজেদের স্বার্থটাকে; তারাই সুবিধা নিতে থাকে সবচেয়ে বেশি। আগে যে ছিলো সহকারি সচিব, ফিরে এসে হয়ে ওঠে সচিব; জীর্ণ স্ত্রী ছেড়ে তারা গ্রহণ করতে থাকে টসটসে বউ। পুরোনো পদ আর পুরোনো বউ তাদের আর তৃপ্ত করতে পারে না। কচি বাঙলাদেশকে ভোগ করার জন্যে তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সম্ভোগে মেতে ওঠে।

একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে;– ১৯৭১-এর এপ্রিলে কামারগাঁয়ে, রাড়িখাল থেকে একটু পশ্চিমের একটি গ্রামে, নানাবাড়িতে, আমার দেখা হয় খুলনা থেকে পালিয়ে আসা এক ডিসির সঙ্গে– সত্যিই সে পালিয়ে এসেছিলো না তাকে বদলি করা হয়েছিলো, তা আমি জানি না। আমার থেকে সে ১৩/১৪ বছরের বড়ো, তাকে আমি ছেলেবেলা থেকেই ভালো ব'লে জানতাম, কিন্তু তার হুংকার শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

সে বললো, 'অই গোয়ালবাড়িগুলি এখনও আছে ক্যামনে, অইগুলিতে এখনও আগুন লাগান হয় নাই ক্যান?'

আমি তাকে এতো ভালো জানতাম, তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হই।

পরে দেখেছিলাম পাকিস্তানিদের মতো সে দীর্ঘ প্রসারিত গোঁফ রেখেছে, তাকে পাঞ্জাবি মেজরের মতো দেখাচ্ছে।

সে হয় ময়মনসিংহের ডিসি, স্বাধীনতার কয়েক দিন আগে– আমি এটা শুনেছি, হয়তো এটা সত্য, হয়তো সত্য নয়– পালিয়ে যায় ভারতে, এবং ফিরে এসেই হয় জাতীয়করণ বিভাগের মহাপরিচালক, অত্যন্ত শক্তিশালী; জিয়ার শাসনের সময় সে হয় জেনারেলের অতি প্রিয়পাত্র, নিজের নামের বানানও বদলে ফেলে, আগের স্ত্রীটিকে বর্জন ক'রে একটি তরুণী স্ত্রী গ্রহণ করে, ময়মনসিংহে থাকার সময় যার সঙ্গে তার হৃদয়বিনিময় হয়, এবং বয়স্কাউটদের প্রধান হিশেবে সে স্কাউটদের পত্রিকায় ছাপতে শুরু করে আরবিফারসি বোঝাই বাঙলা।

পাকিস্তানিরা যে-বাঙলা ভাষা তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলো, যা আমরা পেয়েছিলাম *মাহে-নও* পত্রিকায় : '*গোজাশতা এশায়াতে* আমরা অতীতে বাঙলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা *মোখতাসারভাবে* উল্লেখ করেছিলাম'– এ-ধরনের পাকিস্তানি বাঙলা সে চালু করে বাঙলাদেশে। এ-ধরনের অজস্র সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী আমলা এখনো আছে, যারা সুবিধার পর সুবিধা নিয়েছে, এখনো নিয়ে চলছে। দেশটি নষ্ট করার পেছনে তাদের অমূল্য অবদান রয়েছে। অনেক আমলা কবি, অনেক কবি আমলা; কিন্তু তারা একনায়কদের পদতল চেটেছে প্রাণপণে। এক আমলা কবি লিখেছিলো, 'আমার সময় ছিলো শিকারীর শ্রেষ্ঠ সময়', কিন্তু তখন সে কাজ ক'রে চলছিলো একনায়কের ভৃত্যরূপে। অনেক সময় কপটতাও কবিতা হ'তে পারে।

স্বাধীনতার পর আমরা দেখতে পাই বিদেশি এক ধরনের শকুনের বদলে দেশি আরেক ধরনের শকুনের কবলে পড়েছে দেশ : একটি লাশকে দেশি শকুনেরা ছিঁড়েফেড়ে খেয়ে চলছে।

অনেকের আশা ছিলো মুজিব দেশে ফিরলে সব ঠিক হয়ে যাবে, যেনো তিনি ঐন্দ্রজালিক, যাদুকর, আমাদের তিনি যেমন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তেমনি তিনি মুহূর্তে হাতের একবার আন্দোলনে হাওয়া ক'রে দেবেন আমাদের সব সংকট : দেশ হয়ে উঠবে সোনার বাঙলা। ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারিতে শেখ মুজিবের দেশে ফেরার দৃশ্যটি আমি পথের পাশে দাঁড়িয়ে, হেঁটে হেঁটে, দূর থেকে দেখেছি।

পাকিস্তান থেকে তিনি সরাসরি বাঙলাদেশে আসেন নি; প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় লন্ডনে, সেখান থেকে দিল্লি, তারপর আসেন বাঙলাদেশে। কেনো এতো পথ ঘুরে, বিশ্ব পর্যটন ক'রে, তাঁকে নিজের দেশে আসতে হয়েছিলো, তা আমরা জানি নি। দিল্লি থেকে আকাশবাণীতে মুজিব আমাদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন; আমরা তাঁর কথা

শোনার জন্যে উৎকণ্ঠ ছিলাম। বেশ মনে পড়ে তিনি ইংরেজিতে ভাষণ দিতে শুরু করেছিলেন, আর তখনই ইন্দিরা গান্ধি হিন্দিতে তাঁকে ফিসফিস ক'রে পরামর্শ দেন,– আমরা তা শুনতেও পাই, 'বাঙলা কহিয়ে।' মুজিবের কেনো মনে হয়েছিলো তাঁকে ইংরেজিতে বলতে হবে? ইন্দিরার কেনো মনে হয়েছিলো মুজিবের বাঙলায় ভাষণ দেয়া উচিত?

মুজিবের দেশে ফেরার দৃশ্য আমি দেখেছি।

তখনও তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় জননেতা, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থপতি। পথঘাট লোকে লোকারণ্য– এই একটি অরণ্যেরই অভাব নেই আমাদের দেশে–, ট্রাকে ট্রাকে মানুষ, মুজিব যে-ট্রাকটিতে ক'রে জনতার দিকে হাত নেড়ে নেড়ে ধীরেধীরে এগোচ্ছিলেন, সেটি কিলবিল করা নেতা উপনেতাদের ভারে প্রায় ভেঙে পড়ছিলো, মাটির নিচে ঢুকে যাচ্ছিলো; পতনের শুরু সেদিনই।

আমি দূর থেকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখটি, তাঁর ভেতরটি দেখার চেষ্টা করছিলাম : মুজিবকে মনে হচ্ছিলো অপরিচিত, বহিরস্থিত, আর যে-স্বাধীন দেশটিতে তিনি ফিরছিলেন, সে-দেশটিকে তাঁর কাছে মনে হচ্ছিলো অচেনা, বিদেশ।

এ-দেশ তিনি দেখে যান নি, কল্পনাও করেন নি।

মহাবীর অচেনা হয়ে যাওয়ার পর ফিরছিলেন তাঁর অচেনা স্বদেশে। তিনি এর পর তাঁর দেশকে আগের মতো আর চিনে উঠতে পারেন নি, তাঁর দেশের কাছেও তিনি ক্রমশ অচেনা হয়ে যেতে থাকেন; যুগান্তর সাধনের পর তিনি যেনো নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকেন। রাজনীতিক প্রতিভাও চিরসৃষ্টিশীল থাকে না।

স্বাধীনতা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয় যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে সোনা ঝ'রে ঝ'রে পড়তে থাকবে। আমাদের আকাশ থেকেও সোনা ঝ'রে পড়ে নি, সোনার বাঙলার মাটিও সোনা হয়ে ওঠে নি; সোনা ফলানোর কাজ ছিলো আমাদের, আমরা তা পারি নি, বরং দেশটিকে নষ্ট করেছি– আমাদের স্বপ্নের কাঠামোতে গ'ড়ে তুলতে পারি নি। অনেকে দুঃখে বলে, আগেই ভালো ছিলাম; পাকিস্তানপর্বে অনেক বুড়ো বলতো, 'ব্রিটিশ আমলেই ভালো ছিলাম', যেমন এখনো অনেক বুড়ো বলে, 'আগেই ভালো ছিলাম।' এগুলো বাতুলদের প্রলাপ; আগে আমরা একেবারেই ভালো ছিলাম না, বাঙলাদেশে আমরা সোনা ফলাতে পারি নি, তবু আগের থেকে ভালো আছি।

ব্যর্থ স্বাধীনতাও অনেক উৎকৃষ্ট পরাধীনতার থেকে।

বাঙলাদেশের ভিখিরিও অনেক ভালো আছে পূর্ব পাকিস্তানের ভিখিরিদের থেকে; সচিব, জেনারেল, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আর

গুণ্ডাদের কথা ছেড়েই দিলাম। আমরা যে আমাদের স্বপ্নের কাঠামোতে বাঙলাদেশকে গ'ড়ে তুলতে পারি নি, তা তো এই সচিব, জেনারেল, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আর গুণ্ডাদের জন্যেই। দেশে এখন অনেক রাজাকার আছে, তবে রাজাকারদূষিত বাঙলাদেশ অনেক উৎকৃষ্ট রাজাকারহীন পাকিস্তানের থেকে।

স্বাধীনতার পর অসংখ্য সংকট আমাদের ঘিরে ধরে।

তখন সব কিছুরই অভাব, পথঘাট ভাঙা, খাদ্য নেই, শিশুখাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, বাল্ব নেই, এমনকি সিগারেটও পাওয়া যাচ্ছিলো না– সব কিছুর জন্যেই লাইনে দাঁড়াতে হতো। ওই পরিস্থিতিতে অনেকেই টাকাপয়সা বানিয়ে নিচ্ছিলো, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করছিলো, লুটপাটে মেতে উঠেছিলো শক্তিমানেরা; এবং দেখা দিয়েছিলো রাজনীতিক সংকট। ছদ্মবিপ্লবীরা তখন বিপ্লবী সেজে– মাওসেতুং চারু মজুমদার গুয়েভারার মুখোশ প'রে মাতিয়ে তুলছিলো নগর– তখনকার অনেক সাম্যবাদী এখন মৌলবাদী–, শহর, গ্রাম; প্রেসক্লাবের সামনে সব সময়ই কোনো-না-কোনো দাবি আদায়ের জন্যে জটলা ক'রে চলছিলো বিভিন্ন সংঘ।

তখন অভাব ও দাবির কোনো শেষ ছিলো না।

পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতে হবে, রাজাকারদের বিচার করতে হবে, বন্দী পাকিস্তানি সৈন্যদের বিচার করতে হবে– এসব দাবি তীব্রভাবে চলছিলো; নতুন নতুন বিপ্লবীরা, দশ মাসে মুখে দীর্ঘ দাড়ি আর মাথায় বাবরি রেখে যারা ফিরে এসেছিলো– আন্দোলনে মাতিয়ে তুলছিলো চারপাশ। ওই বিপ্লবীদের অনেকে ছিলো ঘাতক মাত্র, সাম্যবাদের মূলপাঠ তাদের কাছে ছিলো খুন করা, খুনে মেতে উঠেছিলো তারা; তারা ভেবেছিলো যাকে-তাকে খুন করাই হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম; এবং শুরু হয়ে গিয়েছিলো লুঠতরাজ।

শ্রেণীসংগ্রামকে তারা পরিণত করেছিলো ছুরিকা ও থ্রি-নট-থ্রির বিকৃত উল্লাসে, যার শোচনীয় ফল ভোগ করেছে বাঙলাদেশ।

প্রথম দিকে খুনের একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিলো জনগণের মাথায়ও; যাকে তাকে পথে তাড়া ক'রে, রাজাকার বা অন্য কোনো নাম দিয়ে, প্রকাশ্যেই পিটিয়ে লাশে পরিণত করা হতো। আক্রান্ত, বিভীষিকাগ্রস্ত কয়েকজনের ছবি পত্রিকায় বেরিয়ে আমাদের ভয়ভারাক্রান্ত ক'রে তুলেছিলো। আমার এক বন্ধু ও আমি অমন আক্রান্ত একজনকে বাঁচিয়েছিলাম আজিমপুরে; যদি আমরা দুজনে রুখে দাঁড়িয়ে জনগণকে না বোঝাতাম, তাহলে ওই তরুণটি লাশ হয়ে পথে প'ড়ে থাকতো। আমি জানি না সে আজো বেঁচে আছে কি না।

নৃশংস বীভৎস অমানবিক খুনকে, স্বাধীনতার পরপরই, বীরত্বপূর্ণ

ঘটনায় পরিণত করেছিলো কেউ কেউ; এবং সারাবিশ্বে ওই নৃশংস খুনের ছবি প্রকাশিত হয়ে স্বাধীন বাঙলাদেশের মুখে কালিমা লেপে দিয়েছিলো। এখনো নৃশংসতার উদাহরণ হিশেবে পৃথিবীর বিভিন্ন বইয়ে ওই দৃশ্যটি ছাপা হয়; দেখে আমি শিউরে উঠি।

সম্ভবত ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে বা ১৯৭২-এর জানুয়ারির প্রথম দিকে আমরা কয়েকজন *দৈনিক বাংলার* অফিসে ব'সে গল্প করছিলাম, মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরব নিয়ে কথা বলছিলাম, হঠাৎ তখন উর্দি ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে প্রবেশ করেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা– তাঁদের মধ্যে একজন আমাদের বন্ধু, কবি। কবি এমন যোদ্ধা হয়ে উঠেছেন দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। কিন্তু তিনি যা বললেন, তাতে আমরা শিউরে উঠলাম।

তিনি বললেন, আজ বিকেলে তাঁদের মহান নেতা প্রকাশ্যে পল্টন ময়দানে কয়েকজন রাজাকারকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করবেন। রাজাকাররা ছিলো খুবই নিন্দিত, আজ তারা প্রশংসিত; 'আমি রাজাকার ছিলাম' বললে আজ মালা পাওয়া যাবে। তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ জানান ওই দৃশ্য দেখতে যেতে। তাঁরা চ'লে যাওয়ার পর আমাদের ওপর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। আমরা কেউ ওই দৃশ্য দেখতে যাই নি।

কিন্তু পরের দিন পত্রিকায় বেরোয় ওই দৃশ্য; সারাবিশ্বের পত্রিকায় ছাপা হয় অতুলনীয় নৃশংসতার ছবি, নানা টেলিভিশনে দেখানো হয়; তবু ভাগ্য ভালো আমাদের তখন ঔপগ্রাহিক সম্প্রচার শুরু হয় নি। ওই দিনই কালো দাগ লেগেছিলো বাঙলাদেশের স্বাধীনতার মুখে। ওই ছবিটির কথা ভাবলে আজো আমি বিমর্ষ বোধ করি।

দখল তখন হয়ে উঠেছিলো একটি চমৎকার কাজ।

ঘরবাড়ি দখলে, পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া ব্যবসা দখলে মেতে উঠছিলো অজস্র বাহিনী; সবচেয়ে দক্ষতা দেখিয়েছিলো 'মুজিববাহিনী' নামের একটি সংঘ– যেটি শুরু থেকেই কুখ্যাত হয়ে ওঠে, আর 'হাজি'রা দখল ক'রে চলছিলো বিচিত্র রকমের পদ। এক হাজি, যদিও লোক হিশেবে অনেকের থেকে বেশ ভালো, আমাকে বলেছিলেন, তোমাদের ভিসি রাজাকার; আমি বলেছিলাম, তাহলে আমিও রাজাকার। তিনি চুপ ক'রে গিয়েছিলেন, অবিলম্বে ভিসি হ'তে পারেন নি। এখন যে আপত্তিকর 'মহা' বিশেষণটি বিভিন্ন পদের আগে দেখা যায়, সেটা তাঁরই উদ্ভাবন; তিনি কিছু দিনের মধ্যেই একটি 'মহাপরিচালক'-এর পদ পান।

আমাদের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সহজেই মাতবরবংশ বা রাজবংশ গ'ড়ে ওঠে। মুজিবরাজবংশ গ'ড়ে উঠতেও সময় লাগে নি।

দেখা দেয় মুজিবের পরিবারতন্ত্র বা রাজবংশ;– তাঁর আত্মীয়স্বজনের

সংখ্যা কম ছিলো না, ভাই বোন চাচা খালা ভগ্নিপতি ভাগ্নে প্রভৃতি মিলে তাঁর ছিলো এক মহাপরিবার। তাঁর একটি ভাগ্নে অবিলম্বে হয়ে ওঠে মহাশক্তিমান, সন্ত্রাসের পৌরাণিক দেবতা, তার নামে কাঁপতো সবাই; আরেকটি ভাগ্নে হয় সন্ত্রাসের আরেক ছোট্ট দেবতা। তার মুখমণ্ডল থেকে শক্তি ও হিংস্রতা সব সময়ই দ্যোতিত হতো; মুজিবের সুনাম সে যারপরনাই নষ্ট করেছে। তখন নানা দিকে অধিষ্ঠিত হ'তে থাকে মুজিবের আত্মীয়বর্গ, তাঁর দুটি পুত্র ক্রমশ ত্রাসের দুই তরুণ দেবতা হয়ে ওঠে।

দলে দলে দেখা দেয় সুযোগসন্ধানী পুজোরীরা, স্তাবকেরা; তারা নানা স্তোত্র রচনা ও আবৃত্তি করতে থাকে, মুজিবকে ভূষিত করতে থাকে প্রাচীন বিধাতার বিভিন্ন গুণাবলিতে, তিনি হয়ে উঠতে থাকেন বাঙলাদেশের মহাবিধাতা। বিধাতার পুজো ক'রে পুজোরীরা নিজেদের মধ্যে বোধ করে বিধাতার মহিমা, বিধাতাকে সুদূর ক'রে দেয়; মুজিবও ধীরেধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকেন জনগণ থেকে।

জনগণের বহু নেতারই ঘটেছে এ-পরিণতি, জনগণ থেকে তারা ওপরে উঠতে উঠতে, বিধাতা হয়ে উঠতে উঠতে, তারা গর্তে প'ড়ে গেছে।

মুজিব অস্থিরতা বোধ করেন তাঁর পদ নিয়ে, তাঁর পরামর্শদাতারাই হয়তো তাঁকে অস্থির ক'রে তুলেছিলো, কোনো পদই তাঁর জন্যে যথেষ্ট ছিলো না : তিনি রাষ্ট্রপতি থাকবেন না প্রধান মন্ত্রী থাকবেন, কী থাকলে দেশকে ঠিক মতো চালাতে পারবেন, এটা তাঁকে অস্থির ক'রে তোলে, এবং জনগণ তাঁর ওপর আস্থা হারাতে থাকে।

মুজিবের দুর্ভাগ্য তিনি বাঙলাদেশের স্থপতি হ'লেও ওয়াশিংটন বা গান্ধি বা জিন্নার মর্যাদা তিনি পান নি। এর জন্যে দায়ী তাঁর সুবিধাবাদী পুজোরীরা ও ঈর্ষাকাতররা; পুজোরীরা মুজিবকে বিধাতা ক'রে তুলতে গিয়ে তাঁকে সামান্য মানুষে পরিণত করে, ঈর্ষাকাতররা তাঁকে হাস্যকর উপদেবতায় পরিণত করার চেষ্টা করতে থাকে।

তাঁর স্তাবকের, পুজোরীর, সংখ্যা হয়ে উঠেছিলো নক্ষত্রপুঞ্জের সমান।

পুজোরীরা তাঁকে 'জাতির জনক' উপাধি দেয়ার জন্যে মেতে ওঠে।

'জাতির জনক' ধারণাটিই অনেকের কাছে ছিলো আপত্তিকর; 'পিতা', 'জনক' ধারণাগুলো তখন আর আগের মতো আকর্ষণীয় ছিলো না। পিতা? জনক? খুবই সামন্তবাদী ধারণা– কবিরা যখন লিখছিলেন, 'পিতৃহত্যার নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরোয়', তখন 'জাতির পিতা' হওয়ার বাসনা খুব উল্লাসের ব্যাপার ছিলো না।

স্থপতি বা স্রষ্টা? বেশ, কিন্তু পিতা– খুব সুখকর নয়।

পাকিস্তানে 'কায়েদে আজম' দেখে দেখে আমরা খুবই বিরক্ত ছিলাম।

পুজোরীরা তাঁকে ঐশ্বরিক ক'রে তুলতে চায়, 'জাতির জনক' করতে

চায়, যা নিয়ে মাতামাতির দরকার ছিলো না, একদিন সহজেই তিনি এ-মর্যাদা পেতেন। সুবিধাবাদী পুজোরীরা তাঁর নামে সৃষ্টি করতে থাকে নানা মতবাদ, দর্শন, যার মধ্যে সবচেয়ে উপহাসের বিষয় হয়ে উঠেছিলো 'মুজিববাদ'। সাধারণ মানুষ হয়তো বোকা, কিছুই বোঝে না, তারা শুধু মিছিল করতে পারে; কিন্তু রাজনীতিবিদদের নামে প্রচারিত মতবাদকে তারা হাস্যকর ও ক্ষমতার অপব্যবহার ব'লেই মনে করে; আর চতুর যারা, তারা তা উৎপাদন করে ও হিংস্রভাবে প্রচার করে।

পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলো জ্ঞানীদের প্রগাঢ় জ্ঞানচর্চা ও তাত্ত্বিক কাঠামো রচনার পরিণতি; আর ক্ষমতাসীন নেতাদের নামে প্রচারিত মতবাদগুলো হাস্যকর, তুচ্ছ, জনগণের ওপর পীড়ন। ওগুলো সাধারণত তাঁরা নিজেরা তৈরি করেন না, করে তাঁদের নিম্নমানের স্তাবক বুদ্ধিজীবীরা। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে 'গরু' সম্পর্কে একটি শুদ্ধ ও ভালো রচনা লেখাও দুরূহ কাজ।

রাজনীতিক মতবাদ সৃষ্টি এক কথা, আর রাজনীতি করা আরেক কথা। প্রকৃত তত্ত্ব রচনার জন্যে দরকার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা; রাজনীতি করার জন্যে লাগে সংঘ গঠন, নানা তৎপরতা, চক্রান্ত, ও জনতাকে নানাভাবে উত্তেজিত করা। রাজনীতিবিদদের নামে প্রচারিত নানা মতবাদ বিশশতকের মানুষ অনেক দেখেছে; তাঁরা ক্ষমতা থেকে নিক্রান্ত হওয়ার পর ওগুলোও আবর্জনাস্তূপে স্থান পেয়েছে।

মুজিব বিশাল জননেতা ছিলেন, ডেমাগগ ছিলেন, জনতাকে তিনি ঢেউয়ের মতো দোলাতে পারতেন, আগুনের মতো দাউদাউ করাতে পারতেন, কিন্তু কেউ তাঁকে জ্ঞানী বা প্রাজ্ঞ বা বুদ্ধিজীবী মনে করতো না। তিনি শুদ্ধ বাঙলা বা ইংরেজিও বলতে পারতেন না, বলতেন আঞ্চলিক, তাতে কিছু যায় আসে নি– তাঁর 'ভায়রা/ভায়েরা আমার' বিখ্যাত সম্বোধন হয়ে আছে; তাঁর কাছে কেউ রাজনীতিক দর্শন বা তত্ত্ব চায় নি। 'মুজিববাদ'-এর মতো লঘু মতবাদ বা প্রপাগ্যান্ডা প্রচারিত হ'তে দেখে অজস্র দুঃখকষ্টের মধ্যেও জনগণ কৌতুক বোধ করতো। স্তালিন, মুসোলিনি, কিম ইল সুংয়ের খণ্ড খণ্ড রচনাবলি বেরিয়ে জনগণকে ভীত ও স্তম্ভিত করেছে, তবে ওগুলো লিখেছে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা।

স্বাধীনতার পর সংকট ও অভাবের শেষ ছিলো না। তাই তো স্বাভাবিক ছিলো। আমাদের বুকে ছিলো অজস্র মৃত প্রিয়জনের জন্যে শোক, অসংখ্য লাঞ্ছিত নারীর জন্যে যন্ত্রণা, দেশ ভরা ছিলো বিলাপ ও আর্তনাদে; পথ ঘাট খাদ্য বস্ত্র সব কিছুর সংকট।

সাধারণ মানুষ সেগুলো মেনে নিয়েছিলো, কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু আওয়ামি লিগ ও অন্যান্য দলের রাজনীতিবিদেরা, ছাত্রনেতারা, হঠাৎ মার্ক্স-লেনিন-

মাও-চারু মজুমদারবাদে দীক্ষিতরা (অনেকে ভেবেছিলো মুখজুড়ে মাথাভ'রে দাড়ি গোঁফ চুল রাখলেই তারা কার্ল মার্ক্স হয়ে উঠবে), মুজিবের সুবিধাবাদী ক্ষতিকর আত্মীয়বর্গ, এবং আরো অজস্র অশুভ শক্তি দেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু ক'রে দিয়েছিলো। বাঙলাদেশ হয়ে পড়ছিলো অসুস্থ। কারো লক্ষ্য ছিলো না দেশটিকে গ'ড়ে তোলা, সবারই লক্ষ্য ছিলো দেশটিকে নিঃশেষে ভোগ করা। আমরা বিভিন্ন সংঘের মত্ততা দেখতে থাকি; প্রশ্ন করতে থাকি এরই জন্যে কি আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম?

স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ ছিলো না; অভিযোগ ছিলো ক্ষমতা ও ধনমাতালদের বিরুদ্ধে।

আমরা, অসহায় স্বাধীনতাপ্রাপ্তরা, দেখতে থাকি যে-ছাত্রনেতারা মুক্তিযুদ্ধকে গতি দিয়েছিলো, স্বাধীনতার পর তারা ঘৃণ্য দুর্বৃত্ত হয়ে উঠেছে, দেশকে মাৎস্যন্যায়ে বিপর্যস্ত ক'রে তুলছে; এবং তাতে জড়িয়ে পড়তে থাকেন মুজিব নিজেও। ছাত্রলিগ স্বাধীনতার পর মহিমাহীন হয়ে ওঠে, জনগণ তাদের সন্দেহ করতে থাকে, ছাত্রলিগ জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলতে থাকে– 'চার খলিফা'র ভূমিকা এতে খুবই প্রচণ্ড, তখন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে মস্কোপন্থি ছাত্র ইউনিয়ন।

ছ-মাসের মধ্যেই ঢাকা ও রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে তারা জয়ী হয়, সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা জয়ী হয়ে ছাত্রলিগের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্রোধ ও আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। ছাত্রলিগ, তার নেতারা, তাদের গুণ্ডাপাণ্ডারা, মনে করেছিলো দেশটিকে তারাই স্বাধীন করেছে, এবং তারাই এটিকে শেষ করবে। প্রথম তারা শুরু করে দলাদলি : দুজন মহাগুরু দেখা দেয়– একজন প্রচণ্ড উগ্র, মুজিবের পতনের মূলে যে বীজের মতো কাজ করেছে, যে হয়ে উঠেছিলো সন্ত্রাসের প্রতিমূর্তি, সে মুজিবের শক্তিমান ভাগ্নে ফজলুল হক মণি, এবং আরেক গুরু ছিলো সিরাজুল আলম খান, যাকে আজকাল ভগবান রজনিশের মতো দেখায়।

দুই গুরু দুই ধর্মদর্শনের তাত্ত্বিক ও নির্বাহী হয়ে ওঠে। তাদের শক্তির দর্শন শুধু তাত্ত্বিক থাকে নি, তা হয়ে ওঠে খুনোখুনির মন্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা ধাতব অস্ত্রের ছোঁয়া ও স্বাদ পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে বন্দুকের নলই শক্তির উৎস; এবং শক্তির মতো সুখকর আর কিছু নেই।

মণি হয় 'মুজিববাদ'-এর উগ্র সশস্ত্র সেনাপতি, যার হাত থেকে নির্গত হতো অজস্র ক্ষমতা, আর সিরাজুল আলম মার্ক্সের অবয়ব ধারণ ক'রে হয় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এর গুরু, যে এক সময় ছিলো মুজিববাদের মহর্ষি। এ-কলহই মুজিবকে ক্রমশ দুর্বল ও অপ্রিয় ক'রে তুলতে থাকে। মণি ছিলো সব সময় প্রকাশ্যে ও প্রচারে, দ্রুত অপ্রিয় হয়ে উঠছিলো মণি,– বেশি প্রচার সব সময়ই ক্ষতিকর; আর সে যেহেতু ছিলো মুজিবের ভাগ্নে, এবং

আরো একটি ভাগ্নে যেহেতু তার ভাইয়ের সঙ্গে দেশকে আতঙ্কিত ক'রে চলছিলো, এবং জনগণ যেহেতু মনে করছিলো মুজিব প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাঁর গেস্টাপো ভাগ্নেদের। তাই জনগণ দূরে স'রে যেতে থাকে মুজিবের থেকে। মুজিবও দূরে স'রে যেতে থাকেন। আর তরুণরা বিপ্লবের বিভ্রান্ত স্বপ্নে বিভোর হয়ে দীক্ষা নিতে থাকে তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-এ। মুজিব পক্ষ নিয়েছিলেন ভাগ্নে মণির, ছাত্রলিগকে ভেঙে যেতে সাহায্য করেছিলেন।

লড়াই শুরু হয়ে যায়, ১৯৭২-এর ২০ জুলাইয়ে, মুজিববাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতো দুটি ভ্রান্ত ও বিনাশী ধারণার মধ্যে, যার শিকার হয় বাঙলাদেশ, দেশের অজস্র তরুণ, পরিশেষে রাষ্ট্রের স্থপতি। ছাত্রলিগ ভেঙে দুই হিংস্র প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে, রক্তে লাল হ'তে থাকে বাঙলার মাটি; এবং আওয়ামি লিগের স্বার্থপর নেতারাও মেতে ওঠে স্বার্থে ও ভাঙাভাঙিতে। আমরা দেখতে থাকি মুক্তিযুদ্ধের পর শুরু হয়ে যাচ্ছে অমুক্তিযুদ্ধ– সৃষ্টির পর তাণ্ডব ও ধ্বংসলীলা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা এমন হানাহানি দেখি নি, দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ; তারপর দেখি হানাহানি।

বাঙলাদেশ, স্বাধীন, মুক্ত, কিন্তু হয়ে ওঠে ঘাতকদের শিকার।

মুক্তিযুদ্ধের, আওয়ামি লিগের, নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ও সৎ ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। জনগণ তাঁকে পছন্দ করতো; মুজিবকে মনে করতো জনতাজাগানো মহানেতা, আর তাজউদ্দিনকে মনে করতো মস্তিষ্ক। তবে মেধাবী মস্তিষ্করা সাধারণত আক্রান্ত হয় বৃহৎ, পাশবশক্তিসম্পন্ন, মেধাহীনদের দ্বারা; তাজউদ্দিনও তাই হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি কৃতিত্বের সাথে, কিন্তু তখনও ফজলুল হক মণি লিপ্ত হয় তাঁর সঙ্গে বিরোধে। এ-বিরোধ শুভ হয় নি, এ-বিরোধে শুভর জয় হয় নি; প্রবল পশুশক্তিরই জয় হয়। মণি তাঁর মামাকে– মুজিবকে– দিয়ে ১৯৭৪-এর ২৬ অক্টোবরে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারিত করে তাজউদ্দিন আহমদকে, যা মুজিবের ভাবমূর্তি নষ্ট ক'রে অনেকখানি; এবং তিনি পতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

মুজিববাদের মুজিববাহিনী আর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, 'জাসদ'– যেটি জন্ম নেয় ১৯৭২-এর ৩১ অক্টোবরে,– বাঙলাদেশকে বিপর্যস্ত ক'রে তোলে।

এরা সবাই ছিলো লোভী, দুষ্ট, আমরা বুঝতে পারছিলাম, দেশকে দখল করাই ছিলো তাদের লক্ষ্য, তবে তারা দেশকে ধ্বংস করতে থাকে। বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে যে জাসদ আকৃষ্ট করে তরুণদের, যাদের মধ্যে জেগে উঠেছিলো সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন, এবং বেদনাদায়কভাবে তারা নষ্ট হয়।

ওই স্বাপ্নিক বিভ্রান্ত তরুণরা বুঝতে পারে নি তাদের নেতারা ছদ্মসমাজতান্ত্রিক, যাদের কাজ মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি ক'রে নিজেদের স্বার্থ অর্জন করা। আর জাসদের সুযোগ নিয়েছিলো স্বাধীনতার শত্রুরা, তারা এতে পেয়েছিলো আশ্রয়, দেখা দিয়েছিলো বিপ্লবীরূপে।

পরে এই নেতারা প্রমাণ করেছে তারা কতো দূষিত, প্রতিক্রিয়াশীল, ও নষ্ট ছিলো। আল মাহমুদের মতো একজন মৌলবাদী হয়ে উঠেছিলো বিপ্লবী, বড়ো গাড়ি চ'ড়ে সুখ পাচ্ছিলো জাসদের *গণকণ্ঠ*-এর সম্পাদক হয়ে। আমি তাকে একদিন একটি গাড়িতে এমনভাবে বসা দেখেছিলাম, মনে হচ্ছিলো সে দেশের রাষ্ট্রপতি। এখন সে দাড়িটুপিতে জামাতি। মেজর জলিল হয়ে উঠেছিলো মূর্তিমান কার্ল মার্ক্স– চুলেদাড়িতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিরূপ; পরে দীক্ষা নিয়েছিলো ইসলামি মৌলবাদে।

এই ছিলো তাদের বিপ্লব।

মুজিবও অপ্রিয় হয়ে পড়তে থাকেন।

১৯৫২ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রহত্যার মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটেছিলো পাকিস্তানের পতনের; এমনই একটি ঘটনা স্বাধীন বাঙলাদেশে প্রথম ঘটে ১৯৭৩-এর প্রথম দিনটিতে।

ষাটের দশক ছিলো ভিয়েতনামের পক্ষে ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়ার দশক; ঢাকাও মুখর ছিলো ভিয়েতনামের পক্ষে মিছিলে শ্লোগানে। যুক্তরাষ্ট্রের দুর্ভাগ্য, সেখানে সবাই যেতে চায়, কিন্তু সবাই তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। এবার (২০০৩) তো দেখতে পাচ্ছি শান্তির নামে বিশ্ব পক্ষ নিয়েছে সাদ্দামের মতো একটি বর্বর একনায়কের, আর মেতে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এমনি ঘটেছিলো ষাটের দশকে, তখন আমরা শ্লোগান দিয়েছি ভিয়েতনামের পক্ষে, কিন্তু নিয়তির কী মধুর পরিহাস ভিয়েতনাম আজ আমেরিকার অনুরক্ত। ওই ভিয়েতনামের পক্ষে মিছিল বের করে ছাত্র ইউনিয়ন, তোপখানা রোডের মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের সামনে তারা প্রচণ্ড হয়ে ওঠে; এবং পুলিশের কাজ পুলিশে করে। নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা ও কর্মী।

এতে রূপান্তরিত হয়ে যায় ঢাকা শহর, হয়ে ওঠে অগ্নিগর্ভ, সরকারি কর্মচারীরাও বেরিয়ে মিছিলে যোগ দেয়; এমনকি সরকারি পত্রিকা *দৈনিক বাংলাও* প্রকাশ করে একটি সান্ধ্য সংখ্যা।

মুজিবের বিরুদ্ধে তখন ক্ষোভ কতোটা প্রবল হয়ে উঠেছিলো, তার প্রমাণ মেলে পল্টনের এক জনসভায় : এক ছাত্রনেতা ডাকসুর অজীবন সদস্যপদ থেকে মুজিবের নাম বাতিলের ঘোষণা দেয়।

তত্ত্ব গ'ড়ে উঠেছিলো পকিস্তানপর্বেই। আইউব-মোনেম ওসমান গনির সাহায্যে আইউববাদী ছাত্রদল এনএসএফকে দিয়ে দখলে রাখতে চেষ্টা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে।

আমি যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথম এসএম হলে উঠি সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। এনএসএফের গুণ্ডারা, হাউজ টিউটর আবদুল করিমের সহযোগিতায়, আমাদের পেছনের দরোজা দিয়ে গুণে গুণে বের ক'রে দেয়। আমি যেদিন শেষ পরীক্ষা দিই, সেদিন আমাদের ভোজ ছিলো, খেতে ব'সে শুনি হলে এনএসএফের ঘাতকেরা খুনোখুনি শুরু করেছে; আমরা খাবার ফেলে দৌড়ে বেরিয়ে যাই। ওতে নিহত হয় 'পাচপাতু' (শব্দটি অনেকেই বুঝতে পারে না; এটি এক চমৎকার *লোকনিরুক্তি* বা *ফোক এটিমোলোজির* উদাহরণ– *পাস পার্ট টু* থেকে 'পাচপাতু', সে পাসকোর্সের দ্বিতীয় পার্টে পড়তো ব'লে এ-নামে সে বিখ্যাত হয়ে ওঠে) নামে এক কুখ্যাত এনএসএফের ঘাতক।

ওরা মাঝেমাঝেই হকিস্টিক ও ছুরিকা নিয়ে তাড়া করতো, নিজেদের মধ্যেও হানাহানি করতো; শুনেছি ওরা অধিকাংশই নিহত হয়েছে পরস্পরের অস্ত্রের ক্রোধে। কলাভবনে, এস এম হলে, রেসকোর্সে আমরা নিয়মিত ওদের অস্ত্রের মহড়া দেখেছি। ঘাতকদের শুধু অস্ত্রে স্বস্তি হয় না; ওদের কামও পরিতৃপ্ত করার দরকার পড়ে। ওরা রেসকোর্সে (এখন সোহরাউর্দি উদ্যান) কাম পরিতৃপ্ত করতো, চলন্ত গাড়িতে পরিতৃপ্ত করতো, আর করতো বর্তমান মধুর কেন্টিনের দু-দিকে যে-দুটি গোলাকার সাজঘর রয়েছে, সে-দুটিতে।

ওই সাজঘর দুটি অনেক সময়ই রক্তাক্ত থাকতো।

আমাদের সময়ের কিছু সেক্সি, এখন হজকরা ভাঙাচোরা ধার্মিকিনী, তরুণীও ছিলো তাদের বান্ধবী, তাদের ফষ্টিনষ্টি আমরা দেখেছি।

স্বাধীনতার পর একই তত্ত্ব ব্যবহৃত হ'তে থাকে।

মুজিববাদী ছাত্রলিগ মনে করে দেশ তাদের, ডাকসুও তাদের। তাদের সঙ্গে ছিলো মস্কোপন্থি ছাত্র ইউনিয়ন, যেটি তখন জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছিলো ছাত্রলিগের সঙ্গে মিশে; এবং নাম পেয়েছিলো 'ছাত্রলিগের বি টিম'। তখন সরকারবিরোধিতাই ছিলো জনপ্রিয়তার পথ, এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭৩-এর ৩ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ডাকসুর নির্বাচন।

ওতে জয়লাভ করতে যাচ্ছিলো জাসদপন্থি ছাত্রলিগ। মুজিববাদীরা তখন অস্ত্র নিয়ে দেখা দেয়, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ক'রে ছিনতাই ক'রে নেয় জয়। বাঙলাদেশে পরে নির্বাচনের ফলাফল ছিনতাইয়ের ধারা আজো

সমানে চলছে। এতে কলঙ্কিত হয় ডাকসু, মুজিববাদী ছাত্রলিগ, আওয়ামি লিগ, এবং অনেকটা মুজিব নিজে।

ছাত্রদের শিক্ষক দরকার হয়, ফলাফল ছিনতাইয়ের শিক্ষা তারা অবশ্য পেয়েছিলা তাদের নেতাদের কাছেই; কীভাবে নির্বাচনের ফলাফল কেড়ে নিতে হয়, তা তাদের শিখিয়েছিলো মূল আওয়ামি লিগ দলটিই। এই শিক্ষায় তারা পাশ করে, কিন্তু উত্তীর্ণ হয় না।

১৯৭৩-এর ৭ মার্চে বাঙলাদেশের সংবিধানের অধীনে হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনটি তাঁদের জন্যে কাল হয়ে ওঠে।

আওয়ামি লিগের নেতারা মনে করেন দেশ তাঁদের, সংবিধান তাঁদের, এবং নির্বাচনও তাঁদের। তাই জয়ও তাঁদের।

এর মাঝে অবশ্য অধিকাংশ নেতাই কুখ্যাতি অর্জন ক'রে ফেলেছিলেন, নির্বাচনটি সাহায্য করে তাঁদের কুখ্যাতিকে গেজেটবদ্ধ করতে। মুজিব তখন 'জাতির পিতা'র মর্যাদা পেয়ে গেছেন, কোনো দলের নেতা থাকা তাঁর পক্ষে শোভন ছিলো না, তবুও তখনও তিনি ছিলেন আওয়ামি লিগের সভাপতি।

নির্বাচনের আগেই আওয়ামি নেতারা ও তাদের বাহিনী অস্ত্র নিয়ে দেখা দেয়। তারাও জানতো অস্ত্রই সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

অন্য কোনো দলের কাউকে জিততে দেয়া হবে না। জিতলেও জিততে দেয়া হবে না। নতুন দেশে অন্য কারো জেতার অধিকার নেই।

এমনকি জয়ের সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেলেও জয়ী হ'তে দেয়া হবে না। চট্টগ্রামের মোজাফফর ন্যাপের মোশতাক আহমেদ চৌধুরীকে প্রথমে বেতার-টেলিভিশনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়, কিন্তু এ-বিজয় অন্যায়, তাই পরে তা বাতিল করা হয়। অনেক নেতা এতো হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁদের এলাকায় কাউকে দাঁড়াতেই দেন নি। তাঁরা দেশে আদর্শ গণতন্ত্রের পথ প্রদর্শন করেন। আবার অনেকে পাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ফেল করিয়ে দেয়া হয়। ডঃ আলিম আল রাজি, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মেজর জলিল, রাশেদ খান মেনন, মোজাফফর আহমদ পাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ফেল করিয়ে দেয়া হয়, আর পাশ করিয়ে আনা হয় ফেল করা আবদুল মান্নান, আবদুস সামাদ আজাদ, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও আরো কয়েকজনকে। পাশ-ফেল করানো ছিলো আওয়ামি লিগের ইচ্ছে।

ওটি কোনো নির্বাচন হয় নি, হয়েছিলো প্রহসন, ও জাতীয় ট্র্যাজেডি।

আওয়ামি লিগাররা পাশ করেন, এবং শেখ মুজিব অন্য যে-কজন অমেরুদণ্ডিকে পাশ করাতে চান, তাঁদের পাশ করান।

কলঙ্কে সূর্যের মুখ ঢাকা প'ড়ে যায়।

অনেক নেতা ভোট লাভের রেকর্ড গ'ড়ে চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠেন।

বিক্রমপুরে আওয়ামি লিগকে যারা ধ্বংস করে, তাদের প্রধানটির নাম শাহ মোয়াজ্জেম, পরে যে অসংখ্য অশ্লীল কীর্তি স্থাপন করেছে সেনাপতিদের পদতলে প'ড়ে, সে ভোটের পাহাড় পেয়ে বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সে প্রায় সব ভোট পেয়ে যায়, ১ লাখ ৩০ হাজারের মধ্যে ১ লাখ ৭ হাজারেরও বেশি। গাজি গোলাম মোস্তফা, যে ঢাকা নগরকে লুঠ ক'রে চলছিলো, সে শেখ মুজিবের থেকেও বেশি ভোট পেয়ে জাতি ও জাতির পিতাকে বিব্রত ক'রে তোলে।

ঢাকার একটি আসনে মুজিব যেখানে ভোট পান ১ লাখ ৫ হাজার, আরেক আসনে গাজি ভোট পায় ১ লাখ ১০ হাজার। শেখের থেকে গাজির অবশ্যই ওপরে থাকার কথা! কিন্তু এটা হয়ে ওঠে আরেক কলঙ্ক। গাজি পেয়েছে জাতির পিতার থেকেও বেশি ভোট, এটা তো ব্লাসফেমি। এ-ব্লাসফেমি সংশোধন করা দরকার, এবং সংশোধন করতে গিয়ে ঘটে স্যাক্রিলিজ : মুজিবের পাওয়া ভোটের পরিমাণ পরে বাড়িয়ে দেয়া হয়– ঘোষণা করা হয় মুজিব ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ১৪ হাজার।

কী দরকার ছিলো নির্বাচনের? ঘোষণা দিয়ে লোকজনকে পাশ করিয়ে আনলেই হতো। মুজিবের ভোট বাড়ানো হলো, মুজিবকে কমিয়ে দেয়া হলো। যিনি ছিলেন মহাকায়, তিনি জনগণের চোখে হয়ে উঠতে লাগলেন বামন। তিনি যাত্রা করেন অন্ধকারের দিকে।

জনগণের মনে হাহাকার জেগে উঠতে থাকে– আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম? এজন্যে বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

আওয়ামি কলঙ্কিত হয়ে ওঠে, কলঙ্কিত হয়ে ওঠেন মুজিবও; কিন্তু যে-সব রাজনীতিক দুর্বৃত্ত বা নেতা আওয়ামি লিগগে কলঙ্কিত ঘৃণিত ক'রে তোলে, মুজিবের ট্র্যাজেডির পথ তৈরি করে, পরে তারা একের পর এক যোগ দেয় জেনারেল একনায়কদের দলে, মেতে ওঠে আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে। তাদের জন্যেই আজো আওয়ামি লিগের মুখে লেগে আছে কলঙ্কের দাগ; হাসিনা দিনরাত অশ্রুপাত ক'রেও তা মুছতে পারছেন না।

মুজিবের পতনকে এগিয়ে দিয়েছিলো তাঁরই দুটি বাহিনী : লালবাহিনী ও রক্ষীবাহিনী। ১৯৭৩-এ মুজিব একবার একটি ভয়ঙ্কর রূপক ব্যবহার করেছিলেন, বলেছিলেন 'লালঘোড়া দাবড়ানো'র কথা। মানুষ এই অস্পষ্ট রূপকের অর্থ স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারে নি, তাই তারা ভয়ই পায় বেশি। এর পর যখন আবদুল মান্নান নামের এক দুর্বৃত্তের নেতৃত্বে একটি বাহিনী গঠন ক'রে নাম রাখা হয় 'লালবাহিনী', তখন জনগণ মনে করে এটিই মুজিবের রূপকের বাস্তব রূপ। হিংস্রতায় এটি ছিলো গেস্টাপোবাহিনী, যার হিংস্রতা এখনো কিংবদন্তি হয়ে আছে।

আরো একটি বাহিনী গঠিত হয় 'রক্ষীবাহিনী' নামে। এটিও ছিলো অশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং হিংস্রতায় সুদক্ষ। ওটি ছিলো এক ধরনের 'অপারেশন ক্লিন হার্ট', তবে আরো ব্যাপক, আরো ভয়ঙ্কর। বাঙলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী এটিকে ভালো চোখে দেখে নি; তারা মনে করেছিলো এটি দিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করা হবে, তাদের অনেকটা অক্রিয় ক'রে ফেলা হয়েছিলো আগেই। তাই এ-বাহিনীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিলো দ্বিমুখি : সামরিক ও অসামরিক, এবং সব ক্ষোভ ধাবিত হচ্ছিলো মুজিবের দিকে।

মুজিবের সময় অজস্র ভালো কাজ হয়েছে; আন্তোনি যেমন বলেছিলো, 'মানুষ যেসব অন্যায় করে, সেগুলো তার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে; শুধু ভালো কাজগুলো চাপা প'ড়ে যায় তাদের অস্থির সঙ্গে', মুজিবের বেলাও তাই ঘটেছে, জনগণ তাঁর ভালো কাজগুলোর কথা ভুলে গেছে; জনগণ বুঝতেই পারে নি যে ওগুলো ভালো কাজ। ভালো কাজগুলো মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে ভালো কিছু এনে দেয় না, দেয় দেরিতে; কিন্তু খারাপ কাজগুলো মুহূর্তে মানুষকে আক্রান্ত করে।

মুজিবের কথা মনে হ'লে আমার জুলিয়াস সিজারের কথাই মনে পড়ে।

মুজিব ক্রমশ হয়ে উঠতে থাকেন একনায়ক, গণতান্ত্রিক জুলিয়াস সিজার হয়ে উঠতে থাকেন একনায়ক সম্রাট জুলিয়াস সিজার, কিন্তু মুজিবের দুর্ভাগ্য তাঁর কোনো আন্তোনি ছিলো না।

মুজিব পরিবৃত ছিলেন দুষ্ট রাজনীতিক, বিশ্বাসঘাতক, ও স্তাবকদের দ্বারা, স্বার্থপরতা আর কৃতঘ্নতা ছাড়া যাদের আর কোনো প্রতিভা ছিলো না। তাঁরা অনেকে আগে থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে, তিনি তা বুঝতে পারেন নি। চক্রান্ত করার থেকেও যা ভয়াবহ, তা হচ্ছে তারা তাঁকে দূষিত করতে থাকে; জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে।

মুজিবও ভুলে যাচ্ছিলেন নিজেকে ও জনগণকে।

শেক্সপিয়রের *জুলিয়াস সিজার*-এর এ-অংশটুকু আমার মনে পড়ছে :

কাস্কা। তুমি আমার আলখাল্লা ধ'রে টেনেছো, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?

ব্রুটাস। হ্যাঁ, কাস্কা; তুমি আমাদের বলো আজ এমন কী ঘটেছে, যাতে সিজারকে এতো বিষণ্ন দেখাচ্ছে?

কাস্কা। কেনো, তোমরা তো তাঁর সঙ্গে ছিলে, ছিলে না?

ব্রুটাস। তাহলে আমি কাস্কাকে জিজ্ঞেস করতাম না আজ কী ঘটেছে।

কাস্কা। কেনো, আজ তাঁকে একটি রাজমুকুট অর্পণ করা হয়েছিলো; এবং অর্পণের পর তিনি সেটিকে তাঁর হাতের পিঠ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন, আর তখন জনতা হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে।

ব্রুটাস। দ্বিতীয়বারের কোলাহলটির কী কারণ?

কাস্কা। কেনো, তাও ওই একই কারণে।

কাসিয়াস। তারা তিনবার চিৎকার ক'রে উঠেছিলো; শেষের চিৎকারটির কী কারণ?

কাস্কা। কেনো, তাও ওই একই কারণে।

ব্রুটাস। তাঁকে কি তিনবার রাজমুকুট অর্পণ করা হয়েছিলো?

কাস্কা। হ্যাঁ, তাই হয়েছিলো, এবং তিনবারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, প্রতিবারই আগেরবারের থেকে অধিক বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; এবং প্রতিবার প্রত্যাখ্যানের সময়ই আমার সৎ প্রতিবেশীরা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠেছিলো।

কাসিয়াস। কে তাঁকে রাজমুকুট অর্পণ করেছিলো?

কাস্কা। কেনো, আন্তোনি।

ব্রুটাস। কীভাবে অর্পণ করা হয়েছিলো, সেকথা আমাদের বলো সুভদ্র কাস্কা।

কাস্কা। একথা বলার থেকে আমার গলায় দড়ি দেয়াও ভালো : এটা ছিলো নিতান্তই একটা আহাম্মকি; আমি তা ভালো ক'রে দেখিই নি। আমি দেখলাম আন্তোনি তাঁকে মুকুটটি অর্পণ করছে– যদিও ওটা রাজমুকুটও ছিলো না, ওটা ছিলো ছোট্ট মুকুটগুলোর একটি– এবং আমি তোমাদের বলেছি, তিনি সেটি ফিরিয়ে দিলেন; কিন্তু আমার মনে হলো ওটি গ্রহণ করতে পারলে তিনি সুখই পেতেন। সে আবার তাঁকে ওটি অর্পণ করে; তিনি আবার সেটি ঠেলে সরিয়ে দেন, তবে আমার মনে হচ্ছিলো ওটি থেকে আঙুল সরিয়ে নিতে তিনি খুবই অনিচ্ছুক ছিলেন। তারপর ওটি তাঁকে তৃতীয়বার অর্পণ করা হয়; তিনি ওটি তৃতীয়বারও ঠেলে সরিয়ে দেন; এবং এবারও যখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন, তখন জনতা শিস দিতে থাকে, হাততালি দিতে থাকে, এবং ছুঁড়ে দিতে থাকে তাদের ঘামভেজা রাতের টুপি, এবং দুর্গন্ধময় নিশ্বাস ছাড়তে থাকে, কেননা সিজার তাদের রাজমুকুট প্রত্যাখ্যান করেছেন, এতে সিজারের শ্বাস অনেকটা রুদ্ধ হয়ে আসে; এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আমার এতে হাসি পাচ্ছিলো, কিন্তু মুখ খুললেই দূষিত বায়ু ভেতরে ঢোকার ভয়ে আমি হাসতে পারছিলাম না।

মুজিবকে এভাবে রাজমুকুট দেয়া হয় নি, দেয়া হয়েছিলো সংবিধানের 'চতুর্থ সংশোধনী'রূপে। সেটি তিনি হাতে ঠেলে সরিয়ে দেন নি, গ্রহণ করেছেন; সেটি ছিলো রাজমুকুটের থেকেও শক্তিশালী।

এমন ঘটনার জন্য আমরা বাঙলাদেশ চাই নি।

মুজিবকেও 'চতুর্থ সংশোধনী'র মাধ্যমে অর্পণ করা হয় মহারাজমুকুট, ক্ষমতা দেয়া হয় সিজারের থেকেও বেশি। একনায়ক হওয়ার দিকে কেনো তিনি ঝুঁকেছিলেন? গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করলে তো তিনি সেদিকে ঝুঁকতে পারেন না। তাঁর কি মনে হয়েছিলো, তাঁর পুজোরীরা কি তাঁকে বুঝিয়েছিলো, যে তাঁকে বিধাতা হ'তে হবে?

তিনি কি চেয়েছিলেন আমরণ বাঙলাদেশের অধীশ্বর থাকতে? তিনি কি একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা ক'রে রেখে যেতে চেয়েছিলেন যুবরাজদের, যারা তাঁর পরে হবে বাঙলাদেশের নিরঙ্কুশ অধীশ্বর?

'চতুর্থ সংশোধনী'টি পড়ার সময় রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়; করুণা জাগে, এবং দেশ ও তার মহানেতার ভবিষ্যৎ ভেবে হাহাকার করতে ইচ্ছে করে।

মুজিবই ছিলেন বাঙলাদেশে প্রকৃত একনায়ক– মহাএকনায়ক; তাঁর

পরে যে সামরিক স্বৈরাচারীরা এসেছে, তারা তাঁর পাশে তুচ্ছ, আমের আঁটির ভেঁপুবাজানো বালকমাত্র।

একটি রাষ্ট্র সৃষ্টিতে তিনি যেমন মহাকায়, একনায়ক হওয়ার সময়ও ছিলেন মহাকায়– শুধু তখন তাঁর আকৃতিটি বদলে গিয়েছিলো।

চতুর্থ সংশোধনী তাঁকে ক'রে তুলেছিলো মহাএকনায়ক; কিন্তু ওটি ছিলো তাঁর জন্যে আত্মহত্যা; তারপর তিনি বেশি দিন জীবিত ছিলেন না, নৃশংসভাবে ঘাতকদের হাতে নিহত হয়েছিলেন; নিহত যদি নাও হ'তেন, চতুর্থ সংশোধনীর পর তাঁর জীবন হতো ধারাবাহিকভাবে আত্মহত্যা, মহানেতার শোচনীয় মর্মস্পর্শী পরিণতি।

১৯৭২-এ মুজিবের নেতৃত্বে প্রণীত হয় একটি অসাধারণ সংবিধান; কিন্তু ১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারিতে তাঁরই হাতে নিহত হয় তাঁরই অসামান্য সংবিধান : বাঙলাদেশ গণতন্ত্র থেকে পা দেয় চরম একনায়কতন্ত্রে।

আমি তখন দেশে ছিলাম না, কিন্তু সারাক্ষণ উদ্গ্রীব ছিলাম দেশের সংবাদের জন্যে, দেশ সারাক্ষণ আমাকে অস্থির ক'রে রাখতো। প্রতিভোরে ছাত্রাবাসের পাঁচতলা থেকে ছুটে নিচে নামতাম দুটি জিনিশের জন্যে : চিঠি, ও *গার্ডিয়ান* পত্রিকার দ্বিতীয় পাতা দেখার জন্যে। চিঠিতে রাজনীতি ও দেশের অবস্থার কথা বিশেষ থাকতো না, অনেক কষ্টের কথা থাকতো, মাঝেমাঝে থাকতো সমালোচনা; কিন্তু *গার্ডিয়ান*, বেশ প্রগতিশীল পত্রিকা, প্রতিদিনই ছাপতো বাঙলাদেশ সম্পর্কে ছোটোখাটো সংবাদ, যেগুলো সুসমাচার ছিলো না। প্রতিটি ভোর ছিলো বেদনার, যন্ত্রণার, হতাশার। ১৯৭৪-এর বন্যার সময় *গার্ডিয়ান* একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন ছেপেছিলো বাঙলাদেশ সম্পর্কে, লিখেছিলো বাঙলাদেশে শেখ মুজিবের সময় শেষ হয়ে আসছে, তিনি একনায়ক হয়ে উঠছেন, লোকজন প্রকাশ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের কথা বলছে, তিনি মাস ছয়েকের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না, কিন্তু শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে উড়ে বন্যা দেখে এখনো 'স্পিকিং ইন পজেসিভ টার্মস লাইক 'মাই পিপল', 'মাই আর্মি'।' ওই প্রতিবেদন প'ড়ে বেদনায় বুক ভ'রে গিয়েছিলো, দেশের জন্যে ও তার নেতার জন্যে।

চমৎকার, বিশদ, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ভীতিকর ছিলো প্রতিবেদনটি। মুদ্রিত ইংরেজি প'ড়েই আমি মুজিবের ভগ্ন বজ্রকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিলাম, 'আমার জনগণ, আমার সেনাবাহিনী'। একাত্তরের ৭ই মার্চের কণ্ঠস্বর আর তাঁর ছিলো না, আমার তাই মনে হতো।

মুজিবের সামন্ততান্ত্রিক বঙ্গীয় দাম্ভিকতা সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা ছিলো, 'আমি' ও 'আমার' ছিলো তাঁর প্রিয় শব্দ, এবং– 'তুই', তিনি তাঁর প্রিয় বা নিম্নদের 'তুই' বলতেই পছন্দ করতেন ব'লে শুনেছি; এখানেই

তাঁর, ও আমাদের একনায়কদের সঙ্গে, ইউরোপীয় একনায়কদের পার্থক্য। দ্য গল শেষ দিকে খুব অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, ফরাশি ছাত্ররাই শেষে তাঁর পতন ঘটিয়েছিলো; তিনি কখনো 'আমি', 'আমার' মতো অধিকারমূলক দাম্ভিক শব্দ ব্যবহার করতেন না। 'আমি' ও 'আমার' জায়গায় তিনি ব্যবহার করতেন 'ফ্রান্স'; বলতেন, 'ফ্রান্স এটা কখনো সহ্য করবে না', 'ফ্রান্স এটা মানবে না'; কিন্তু মুজিব 'বাঙলাদেশ'-এর জায়গায় ব্যবহার করতেন 'আমি': যেখানে তাঁর বলার কথা ছিলো 'বাঙলাদেশের জনগণ', 'বাঙলাদেশের সেনাবাহিনী', সেখানে তিনি বলতেন, 'আমার জনগণ, আমার সেনাবাহিনী।' দ্য গল নিজেকে ক'রে তুলেছিলেন ফ্রান্স, মুজিব বাঙলাদেশকে ক'রে তুলেছিলেন 'আমি'– পশ্চিম আর পুবের মধ্যে এটা এক লক্ষণীয় পার্থক্য।

মুজিবের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে আমি এক সহকর্মী অধ্যাপককে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি ব্যাপারটিকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন 'শাদাদের বাজেকথা' ব'লে; কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে শাদাদের বাজেকথা যখন সত্য প্রমাণিত হয়, তখন আবার আমি বুঝতে পারি শাদারা আমাদের থেকে কতো বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। কিছুই গভীরভাবে দেখার অভ্যাস আমাদের নেই, শাদাদের আছে।

এক বিয়ের অনুষ্ঠানে এক মেজরের স্ত্রীকে নিয়ে মেজরের সঙ্গে মুজিবের এক পুত্রের যে-বচসা হয়, তাও *গার্ডিয়ান*-এ বেরিয়েছিলো; এটা থেকে অশুভ কিছু ঘটতে পারে ব'লেও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিলো এক প্রতিবেদনে। *গার্ডিয়ান* বাঙলাদেশবিরোধী ছিলো না, ছিলো পক্ষেই। মুজিবপুত্রের বিয়েতে রাজমুকুটের সংবাদ গিয়েও পৌঁছোতো, এবং গিয়ে পৌঁছোতো পথে পথে প'ড়ে থাকা লাশের সংবাদ। যুবরাজের বিয়েতে মুকুট পরানো হচ্ছে, পথে পথে লাশ প'ড়ে থাকছে, লাশ বিক্রি হচ্ছে, হিংস্র রক্ষীবাহিনী ত্রাস সৃষ্টি ক'রে চলছে– এসব সংবাদ পেয়ে রক্ত কাঁপতো, বাঙলাদেশের মানচিত্রকে সোনার জুতোপরা পায়ে দলিত রুগ্ন জীর্ণ অনাহারে মৃত ভিখিরির লাশ মনে হতো।

প্রকৃতি বেশি আতিশয্য সহ্য করে না, ইতিহাসও করে না।

১৯৭৫ অব্দের ২৫ জানুয়ারি বাঙালি, বাঙলাদেশ, ও মুজিবের জন্যে রাহুগ্রাসের দিন– ওই দিন মধ্যাহ্নেই অস্তমিত হয় বাঙলাদেশের সূর্য; ওই দিন বাঙলাদেশের সংবিধানকে ঠাণ্ডা মাথায় বলি দিয়ে গ্রহণ করা হয় 'চতুর্থ সংশোধনী'।

এই বলির জন্যেই কি তিনি রচনা করেছিলেন ওই অপূর্ব সংবিধানটি? এতে কি তিনি অসুস্থ বোধ করেন নি? সিজার অন্তত তিনবার মুকুট ফিরিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি তাও করেন নি।

এর আগে, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ, ঘোষণা করা হয়েছিলো জরুরি অবস্থা, যা কেড়ে নেয় মানবাধিকার। জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণ কী ছিলো? বলা হয়েছিলো বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্যের বিরুদ্ধে একটি সংঘ চালিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের অস্তিত্বের জন্যে; তাই জরুরি অবস্থা ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এটা ঠিক যে দুর্বৃত্তরা তখন বিপ্লবী হয়ে দেখা দিয়েছিলো, তাদের হাতে হাতে অস্ত্র; তবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা ক'রে কিছুই দমন করা যায় না, শুধুই ডেকে আনা যায় নিজের পতন।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর সবচেয়ে বড়ো ঘটনা পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির হত্যাদক্ষ নেতা সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার ও হত্যা। সিরাজ সিকদার প্রকৃতপক্ষে কোনো বিপ্লবী ছিলো না; সে যদি রাষ্ট্র দখল করতে পারতো, তাহলে বাঙলাদেশকে সে ক'রে তুলতো একটি কম্পোচিয়া; রক্তের প্রবাহ তাকে বিশেষ সুখ দিতো। তবে সে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলো, কেননা আওয়ামিরা যখন পেতে বসেছিলো দুঃশাসন, তখন সে তাদের রক্তপাত ঘটিয়ে শিহরণ জাগিয়ে জনগণকে সুখী ক'রে তুলেছিলো। জনগণ তখন অন্যের রক্তপাতের সংবাদ শুনে সুখী হতো। তরুণরা আকৃষ্ট হয়েছিলো তার প্রতি, যদিও সে কোনো লেনিন, মাওজেদুং, কাস্ত্রো ছিলে না। তার থেকে অনেক বেশি বয়স্ক একজন লেখিকাকে, ও আরো কয়েকজন নারীকে, সে কেমন ক'রে ধ্বংস করেছে, সে-কাহিনী আমি কারো কারো মুখে শুনেছি। অবশ্য বসুন্ধরা ও নারী বীরভোগ্যা, এটাই প্রাচীন প্রবাদ; বসুন্ধরা ও বহু নারী বীরদের সুখী ও নিজেদের ধ্বংস ক'রে স্মরণীয় হয়ে আছে। তার দল খুনে মেতে উঠেছিলো, এবং বহুদলে ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছিলো দিন দিন। নিজেরা খুন ক'রে চলছিলো নিজেদের। শোনা যায় তার দলের লোকেরাই তাকে ধরিয়ে দেয়। সিরাজ সিকদারকে ধরতে পেরে স্বস্তি বোধ করেছিলো মুজিবের সরকার।

১৯৭৫-এর ১ জানুয়ারি সে ধরা পড়ে, ২ তারিখে সাভারে তাকে হত্যা করা হয়। কীভাবে হত্যা করা হয়? ঠিক রীতিটি আমরা জানি না। পুলিশ যেমন আজো তাদের অপকর্ম ঢাকার জন্যে মিথ্যে বিজ্ঞপ্তি দেয়, দিয়েছিলো তখনী; ৩ তারিখে পুলিশবিভাগ জানিয়েছিলো সিরাজ সিকদার পুলিশের গাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলো, তখন পুলিশের গুলিতে নিহত হয় সিরাজ সিকদার। একথা কেউ বিশ্বাস করে নি, যেমন আজো আমরা পুলিশ ও সরকারের কোনো বিজ্ঞপ্তিই বিশ্বাস করি না। জনগণ জানে সরকারের বিভিন্ন বাহিনী ও আলয়ের কাজই অপকর্ম ক'রে ডাহা মিথ্যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া। এ-হত্যার কলঙ্কও বহন করতে হয় মুজিবকেই; বিশেষ

ক'রে ১৯৭৫-এর ২৫ মার্চে মুজিব জাতীয় সংসদে যে-হুংকার দেন, 'কোথায় আজ সিরাজ সিকদার?', তা আজো বাঙালির কানে বাজে। বজ্রকণ্ঠ তখন পরিণত হয়েছে হুংকারে।

এর ২৭ দিন পর, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫, মুজিব একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে গ্রহণ করিয়ে নেন 'চতুর্থ সংশোধনী বিল'। বিলটি চরম একনায়কত্বের বিল, এতো ভয়াবহ যে ভাবতেও রক্ত তুষার হয়ে ওঠে।

সংসদে এটি নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নি, কেননা আলোচনা করা সম্ভব ছিলো না; মুজিব তা চেয়েছিলেন আর তাঁর স্তাবকেরা হয়তো আরো বেশি চেয়েছিলো।

মাত্র ১ ঘণ্টায় বাঙলাদেশের মহান সংবিধানকে হত্যা করা হয়।

ওটা ছিলো হত্যাকাণ্ডই, দীর্ঘ ছুরিকার দিন– ছুরিকার পর ছুরিকা চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করা হয় বাঙলাদেশের সংবিধানকে।

প'ড়ে থাকে সংবিধানের মৃতদেহ।

এদিন মৃত্যু ঘটে সংসদীয় পদ্ধতির, চালু হয় রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতি। এ-পদ্ধতিতেও গণতন্ত্র চলতে পারে, যেমন চলছে যুক্তরাষ্ট্রে, কিন্তু এতে এমন সব বিধান তৈরি হয় যার প্রতিটি ধারা জনগণবিরোধী। একজনকে সর্বশক্তিমান করার জন্যে এটি তৈরি করা হয়, এটি একজনকে রাষ্ট্রবিধাতা করার শোচনীয় পুণ্যগ্রন্থ। মুজিব হন রাষ্ট্রপতি, বাঙলাদেশের বিধাতা; দেশের স্থপতি জননেতা দেখা দেন মহাএকনায়করূপে।

সিজারকে তিনবার মুকুট দিয়েছিলো আন্তোনি, সে হাতের পিঠ দিয়ে তা ফিরিয়ে দিয়েছিলো, যদিও হাত সরাতে তার ইচ্ছে করছিলো না; ২৫ জানুয়ারিতে সংসদে যখন মুজিবকে সর্বময় ক্ষমতা দেয়া হয়, তখন না কি তিনি বলেছিলেন, 'আজ যে শাসনতন্ত্র, আজকে আমার দুঃখ হয়, আজ আপনারা আমাকে এই *কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্টের* সাথে আমাকে *প্রেসিডেন্ট* করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। *প্রাইম মিনিস্টার* হিসেবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন। আমরা *টু-থার্ড ম্যাজরিটি*, তবু আপনারা *অ্যামেন্ডমেন্ট* করে আমাকে *প্রেসিডেন্ট* করেছেন।'

তাঁর এ-বিনয় সিজারের বিনয়ের থেকেও করুণ মনে হয়।

এখানে লক্ষ্য করার মতো বিষয় তাঁর ভাষা : এক বাক্যে অনেকগুলো ইংরেজি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। এতোগুলো ইংরেজি শব্দ দরকার ছিলো না; তবে সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি যতো বক্তৃতা দিয়েছেন, বিশেষ ক'রে সাংসদ ও আমলাদের সামনে, সেগুলোতে তাঁর ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের হার শোচনীয়ভাবে বেড়ে গিয়েছিলো। এই ইংরেজি শব্দের প্রাচুর্য হয়তো ইঙ্গিত করে যে তিনি দূরে স'রে যাচ্ছিলেন জনগণ থেকে।

মুজিব সেদিন চতুর্থ সংশোধনীর নামে আত্মহত্যা করেন, তিনি তা বোঝেন নি; এর পর প্রতিদিন তিনি ধারাবাহিকভাবে ক'রে চলেন আত্মহত্যা, এবং একদিন ঘাতকদের হাতে নিহত হন।

সিজার যেদিন সম্রাট হয়েছিলো, মুকুট পরেছিলো, নিহত হয়েছিলো তার পরদিনই; তার ঘাতকেরা ছিলো গণতান্ত্রিক আদর্শবাদী, আর মুজিবের ঘাতকেরা ছিলো আপাদমস্তক ঘাতক, শুধুই ঘাতক; তার সঙ্গে অবশ্য গণতন্ত্রের কোনোই সম্পর্ক নেই।

চতুর্থ সংশোধনীটিও ছিলো ঘাতক; সেটি হত্যা করে বাঙলাদেশের সংবিধানটিকে, তারপর তার রক্তপাতের ধারা বয়ে চলতে থাকে বাঙলাদেশের ওপর দিয়ে, যা আজো বয়ে চলছে।

চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়েছিলো যে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত হ'তে হবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে; তবে মুজিব আবার নির্বাচিত হ'তে চান নি, তাঁর অনুগতরা আরো চায় নি।

তাই একটি বিধান যোজিত হয় : 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন এবং উক্ত প্রবর্তন হতে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন যেন তিনি এই আইনের দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।'

এটা এক দুঃস্বপ্নের বাস্তবায়ন; যা ঘটে নি, তাকে ঘটেছে ব'লে ধ'রে নিতে হবে! জুলিয়াস সিজারকে যেমন জনগণের পক্ষে তিনবার মুকুট দেয় আন্তোনি, সিজার প্রতিবার তা প্রত্যাখ্যান করে, জনগণ হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ে, শেষে সে তা গ্রহণ করে, এটাও অনেকটা তেমনি। সংসদে কি তখন চলছিলো হর্ষধ্বনি? যদি হর্ষধ্বনি উঠে থাকে, উচ্ছ্বসিত কোলাহল ধ্বনিত হয়ে থাকে তাহলে তা ছিলো বাঙলাদেশের বিলাপ।

সংসদও ভেঙে দেয়া দরকার ছিলো, কিন্তু ভাঙা হয় নি।

একটি বিধান দিয়ে আগের সংসদকে আরো ৫ বছরের আয়ু দান করা হয়। এক পচা দুর্গন্ধময় মেথরপট্টির সংসদীয় মৃতসঞ্জীবনী পান ক'রে ৫ বছরের জন্যে অমরত্ব লাভ করে মুমূর্ষু সংসদ। এ-ধরনের ঘটনাকে বলা হয় 'নীরব অভ্যুত্থান', যা অবৈধ, অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক– তবে তা নীরব থাকে না, জনগণের ভেতরে নীলাকাশ থেকে ধাবিত বজ্রপাতের মতো অবিরাম বিস্ফোরিত হ'তে থাকে; তাই ঘটেছিলো বাঙলাদেশে, এবং ওই নীরব অভ্যুত্থানে নীরবে নিহত হয়েছিলেন শেখ মুজিব। তা তিনিও বোঝেন নি, ওই সংসদও বোঝে নি।

চতুর্থ সংশোধনীটি পড়ার সময় ভয়াবহ ভয় লাগে, মনে হয় এখনই আমার কলজেটা ছিঁড়ে রক্ত পান করবে অজস্র ড্রাকুলা। তবে এটা কোনো

হরর ছায়াছবি নয়, এটা নিজেই চরম হরর।

আদি, দুর্গত, করুণ, নিহত সংবিধানে ছিলো দু-বারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হ'তে পারবেন না, থাকতে পারবেন না। সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নকল ক'রে রচিত হয়ছিলো এটি। রচনার সময় তাঁদের হয়তো মনে ছিলো না জর্জ ওয়াশিংটনের কথা।

চতুর্থ সংশোধনীতে তা লোপ করা হয়, বিধান করা হয় তিনি, অর্থাৎ মুজিব, যতোবার ইচ্ছে ততোবার, আজীবন, রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন। মুজিব তাই চেয়েছিলেন? নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন। মুজিব বেঁচে আছেন, অথচ অন্য কেউ বাঙলাদেশ চালাচ্ছে, এটা মুজিব ও তাঁর পুজোরীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। কিন্তু এটা ছিলো নিয়তির নির্মম পরিহাস।

রাষ্ট্রপতিকে অমর ও প্রভু ক'রে রাখতে হবে– এই ছিলো চতুর্থ সংশোধনীর পবিত্র উদ্দেশ্য। একটি কথা তারা লেখে নি যে রাষ্ট্রপতি চিরকাল জীবিত থাকবেন, ম'রে গেলেও তাঁকে জীবিত গণ্য করতে হবে।

তারা পুরোপুরি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ছিলো না।

রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের বিধি থাকে সমস্ত সংবিধানেই, ছিলো আমাদের আদি সংবিধানেও। বিধান ছিলো রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ– অভিশংসন– করতে চাইলে সংসদ সদস্যরা প্রস্তাব আনবেন, তার জন্যে দরকার হবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেটিকে গৃহীত করার জন্যে লাগবে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা।

চতুর্থ সংশোধনীতে এটিকে চরম দুরূহ ক'রে তোলা হয়।

বিধাতার বিরুদ্ধে কেউ অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে না।

বলা যেতো রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাবে না।

তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা এক ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহিতা; কার এতো সাহস যে অনাস্থা প্রস্তাব আনে বিধাতার বিরুদ্ধে?

এটা অসুন্দর দেখাতো হয়তো।

যারা চতুর্থ সংশোধনী এনেছিলো, তাদেরও সৌন্দর্যবোধ ছিলো!

তাই বলা হয় সংবিধান লংঘন (সেটি তখন কোথায় যে তাকে লংঘন করবেন?), মানসিক বা শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যাবে; তবে একটা গগনচুম্বী 'কিন্তু' জুড়ে দেয়া হয়।

বলা হয় অপসারণের প্রস্তাব আনতে হ'লেই লাগবে দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা, আর তা গৃহীত করার জন্যে লাগবে তিন-চতুর্থাংশ গরিষ্ঠতা।

অর্থাৎ যদি ১০০ জন সদস্য থাকে, তাহলে প্রস্তাব আনতেই লাগবে ৬৭জন, আর গৃহীত করানোর জন্যে লাগবে ৭৬জন!

যা এক অসম্ভব ব্যাপার; এর চেয়ে সূর্যকে একদিনের জন্যে উঠতে না

দেয়াও সহজ।

রাষ্ট্রপতি হয়ে ওঠেন সংবিধানের থেকেও পবিত্র। কেননা সংবিধান, একটা তুচ্ছ জিনিশ, সংশোধন করতে লাগে $^{২}/_{৩}$ গরিষ্ঠতা, আর রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করতে লাগে $^{৩}/_{৪}$ গরিষ্ঠতা। রাষ্ট্রপতি হয়ে ওঠেন সংবিধানের প্রভু, তিনি অনেক ওপরে সংবিধানের; সাত আশমানের ওপর বিরাজ করেন তিনি।

মুজিব হয়ে ওঠেন প্রভু, সংবিধান হয় তাঁর পদতলের পাপোশ।

আমাদের স্বাধীনতা করুণ হয়ে উঠতে থাকে।

শুধু তাই নয়, বাঙলাদেশ থেকে গণতন্ত্রকেও বিদায় জানানো হয়। আমরা নিজেদের যতোই বাঙালি বলি না কেনো, আসলে তো শূদ্রজাত মুসলমান। মুসলমানের পক্ষে গণতন্ত্র চর্চা খুবই অসম্ভব কাজ; তারা নবাব বাদশা রাজা হ'তে পারে, গণতান্ত্রিক হ'তে পারে না। আমি আজ পর্যন্ত ভিখিরি থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত মুসলমানের মধ্যে গণতন্ত্রের 'গ'ও দেখি নি। ক্ষমতায় গিয়ে একেকটি চুনোপুঁটি মন্ত্রীও এমন আচরণ করে যেনো সে বিশ্বের অধিপতি হয়ে উঠেছে।

গণতান্ত্রিক দেশে থাকে বহু দল।

সাধারণত দু-তিনটি দল ক্রমশ প্রধান হয়ে ওঠে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি দল প্রধান হয়ে উঠেছে, যুক্তরাজ্যেও এখন দুটি দলই প্রধান। একমাত্র স্বৈরাচারী একনায়কধর্ষিত দেশেই থাকে মাত্র একটি দল, যা কাজ করে ঘাতকসংঘের মতো। স্টালিনের একদল, মাওসেতুংয়ের একদল, কাস্ত্রোর একদল, কিমের একদল, সাদ্দামের একদল; স্বৈরাচার একাধিক দল ও মত সহ্য করে না। বাঙলাদেশেও তাই করা হয়; চতুর্থ সংশোধনী প্রতিষ্ঠা করে একটি মাত্র দল, সংক্ষেপে যার নাম 'বাকশাল'; বলা হয় যে দেশ শাসিত হবে এ-দলটি দিয়েই। রাষ্ট্রপতি থাকবেন দলের প্রভু, সংসদে কোনো বিরোধী দল থাকবে না; তাই রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের কথাই ওঠে না।

চতুর্থ সংশোধনী মুজিবের মুঠোতে ভীতিকর অস্ত্র অর্পণ করে। তিনি হয়ে ওঠেন সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্র ও উৎস; জিহোভার মতো শক্তিমান।

তখনও থাকে একটি সংসদ; এ-ধরনের শোভা দরকার হয় একনায়কতন্ত্রে। সংসদ ধারণ করে কী রূপ? এটি কি আর সংসদ থাকে? এটি পরিণত হয় একটি বিকলাঙ্গ পুরাতন ভৃত্যে। বাঙলাদেশের সংবিধানে সংসদ ছিলো রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণতম অঙ্গ, রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক; এর থেকেই উৎসারিত হতো সমস্ত আইন ও কর্তৃত্ব। চতুর্থ সংশোধনী একে ক'রে তোলে শোচনীয়রূপে অথর্ব, এর কোনোই ক্ষমতা থাকে না। এটি রাষ্ট্রপতির পায়ের নিচে চাপা প'ড়ে ধন্য হয়।

বাঙলাদেশের সংবিধানে একগুচ্ছ, ১৮টি, অধিকার দেয়া হয়েছিলো

জনগণকে। বাঙলাদেশের তুচ্ছ মানুষও ১৮টি অধিকার পেয়েছিলো, এও এক বিস্ময়! নামমাত্র ক্ষমতা দিলেই তো মানুষ ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না, ওই ক্ষমতা যাতে জনগণ ভোগ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করার অধিকার দেয়া হয়েছিলো উচ্চবিচারালয়কে। চতুর্থ সংশোধনী আর এটা মানে না, এটি উচ্চবিচারালয়কেও অথর্ব ক'রে তোলে, তার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। উচ্চবিচারালয় যাতে জনগণের মৌলিক অধিকারের বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্যও করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা হয়।

অর্থাৎ জনগণের আর কোনো মৌলিক অধিকার রইলো না; অধিকারের জন্যে জনগণ কোনো দাবিও জানাতে পারবে না। জনগণের আবার অধিকার কী? তারা স্বাধীন হয়েছে, তাই তো যথেষ্ট। এখনো আমাদের মৌলিক অধিকার আছে খুবই সামান্য।

বাঙলাদেশের স্বাধীন নাগরিকেরা, যারা কয়েক বছর আগে একটি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের জন্যে, তারা হারিয়ে ফেলে সে-সব। তারা হয়ে ওঠে স্বাধীনভাবে অধিকারহীন।

চতুর্থ সংশোধনীর সব বিধিই ভয়াবহ; তার মধ্যে ভয়াবহতমটি হলো একদলীয় শাসনব্যবস্থা। সংশোধনী দ্বিধাহীনভাবে, আনন্দের সঙ্গে, বলে যে রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো বাস্তবায়িত করার জন্যে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে দেশে থাকবে মাত্র একটি দল, তাহলে তিনি ঘোষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁর স্বপ্নের একদল।

মূলনীতি বাস্তবায়ন? ওগুলো আর তখন কোথায়? সব মূলনীতি তখন লাঞ্ছিত হয়ে গেছে; আছে শুধু একটি নীতি– রাষ্ট্রপতি বা মুজিব।

রাষ্ট্রপতি কী কী করতে পারেন? কী পারেন না তিনি? তিনি সব পারেন। তিনি সিজারের থেকেও বেশি পারেন।

তিনি দেশে মাত্র একটি রাজনীতিক দলের ঘোষণা দিতে পারেন। সেটিই হবে দেশের অনন্য জাতীয় দল।

তাঁর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে অন্য সব দল।

রাষ্ট্রপতি জাতীয় দল ঘোষণা করবেন, তাঁর নাম রাখবেন, কাঠামো গঠন করবেন, তার কাজ কী হবে তা ঠিক করবেন, এমনকি কে কে তার সদস্য হবে বা হ'তে পারবে না, তাও তিনি ঠিক করবেন। তিনিই হবেন বিধাতা, তাঁর কথাই শেষ কথা।

সরকারি কর্মচারিরা কি রাজনীতি করবে? করবে না কেনো? তারা কি দেশের মানুষ নয়? এ-সংশোধনী সরকারী কর্মচারীদেরও নষ্ট করে। তারা এভাবেই ছিলো নষ্ট, ঘুষ খাওয়া, মানুষকে বিপদে ফেলা, ছিলো তাদের কাজ; এবার তাদের অনেকে নেতা হয়ে ওঠে।

জাতীয় দলের সদস্য না হ'লে কেউ মানুষ নয়, বাঙলাদেশের মানুষ

নয়, সে যতোই বাঙালি হোক-না-কেনো। মানুষ/বাঙালি হ'তে হ'লে তাকে মহান জাতীয় দলে যোগ দিতে হবে। ফুলের মালা নিয়ে মিছিল ক'রে গিয়ে স্তব করতে হবে– 'হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'। মুজিব এটা নিশ্চয়ই উপভোগ করেছিলেন।

যখন ইচ্ছে তখন জাতীয় দলে যোগ দেয়া যাবে না। রাষ্ট্রপতি ঠিক ক'রে দেবেন কতো তারিখের সূর্যাস্তের আগে জাতীয় দলে যোগ দিতে হবে, তার পরে আর হবে না, যতোই সে বাঙালি হোক।

জাতীয় দলে যদি কেউ যোগ না দেয়? তাহলে সে কেউই নয়। আর যোগ না দেয়ার মতো মস্তক আছে কার?

কেউ যদি সংসদের সদস্য হ'তে চায়? তাহলে তাকে অবশ্যই পেতে হবে জাতীয় দলের মনোনয়ন। কে মনোনয়ন দেবেন? আর কে? তিনি সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রপতি।

বাঙালিরা অবশ্য মেতে উঠেছিলো বাকশালে যোগদানে; যোগদানের মত্ততা শুরু হয়ে গিয়েছিলো, যেমন তারপরও, ছোটো আকারে, মত্ততা শুরু হয় যখন দুই সেনাপতি একনায়ক তাঁদের মহাদল গঠন করেন।

মুজিব কী হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন? সিজার? নেপোলিয়ঁ? হিটলার? স্টালিন? কী হ'তে চেয়েছিলেন তিনি? তাঁর কেনো এতো ক্ষমতার দরকার হয়েছিলো? এতো ক্ষমতা শুধু পতন ডেকে আনে।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫-এ দেশকে সমাজতন্ত্রিত করার জন্যে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামি লিগ' (বাকশাল)। অন্য সব দল লোপ পায়, একটি মাত্র দল জেগে ওঠে; এটি শুধু রাজনীতিক দল থাকে না, এটি অন্তর্ভুক্ত হয় সংবিধানে।

তাই এটি হয় সরকারের অঙ্গ বা সন্ত্রাসী বাহিনী। বাঙলা ভাষায় সংক্ষেপিকরণ অনেক সময়ই হয় বিদঘুটে, আর 'বাকশাল' শব্দটিকেও কিম্ভূত লাগে, লাগে ভীতিকর; নামটি হয়ে ওঠে কলঙ্কিত; তাই এখন নামটিও কেউ নেয় না।

এর পর শিকার হয় দেশের সংবাদপত্রগুলো। ১৯৭৫-এর জুন মাসে চারটি পুজোরী দৈনিক রেখে আর সবগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়; টিঁকে থাকে শুধু *দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, বাঙলাদেশ টাইম্‌স্* ও *বাঙলাদেশ অবজারভার*। তবে এগুলো কোনো স্বাধীন পত্রিকা থাকে না; এগুলো হয় সরকারের প্রচারপত্র, এগুলোর মালিক একদলীয় সরকার।

স্বাধীনতার পর সমস্যার শেষ ছিলো না; অভাব ছিলো সব কিছুর, আর অজস্র ছদ্মশ্রেণীসংগ্রামী বাহিনী গ'ড়ে উঠে দেশকে বিপর্যস্ত করছিলো; ওই বিপর্যয়কে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলো আওয়ামি লিগের নেতারাই। ওই নেতাদের অধিকাংশের ওপরই জনগণের কোনো আস্থা ছিলো না, অনেকেই

হয়ে উঠেছিলো বড়ো দুর্বৃত্ত; এবং মুজিবের পরিবারতন্ত্র মুজিবকে খুবই দ্রুত অপ্রিয় ক'রে তুলছিলো জনগণের কাছে। তাঁর দুটি পুত্র, তাঁর ভাগ্নেরা তাঁর অশেষ ক্ষতি করেছিলো।

লালবাহিনী ও *রক্ষীবাহিনী* ত্রাস সৃষ্টি ক'রে চলছিলো; দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আওয়ামি লিগের নেতারা কোন্দল ক'রে এলাকাগুলোকে রক্তাক্ত ও আওয়ামি লিগবিরোধী ক'রে তুলছিলো। বিক্রমপুরের কথাই ধরা যাক; সেটি ছিলো আওয়ামি এলাকা, কিন্তু দুই দুর্বৃত্ত নেতা কোন্দল ক'রে হানাহানিতে মাতিয়ে তুলেছিলো তরুণদের। এর সুদূরপ্রসারী ফল হচ্ছে বিক্রমপুরকে হারিয়ে ফেলেছে আওয়ামি লিগ; ফিরে পেতে অনেক বছর লাগবে। এমন ঘটেছে সারা দেশ জুড়েই।

মুজিবের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস ও অভাবিত হত্যাকাণ্ডগুলোর একটি। সবচেয়ে বিশাল ও ভারি যে-লাশটি বাঙলাদেশ নিজের বুকের কবরে বয়ে চলছে, সেটি মুজিবের লাশ।

তাঁর ঘাতকেরা সংখ্যায় বেশি ছিলো না; মাত্র ৭টি কর্নেল-মেজর ও কয়েকজন অনুচর ঘটিয়েছিলো বাঙলাদেশের ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডটি। ঘাতকেরা সংখ্যায় কম হ'লেও ছিলো হননে চরম সুদক্ষ ও পরিকল্পনায় নিখুঁত, উদ্যমে অবিচল। ম্যাসক্যারেনহ্যাস তাঁর *বাঙলাদেশ : এ লেগ্যাসি অফ ব্লাড* বইতে তাদের পরিকল্পনার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তা প'ড়ে শিউরে উঠতে হয়; বোঝা যায় এক ধরনের মত্ততা পেয়ে বসেছিলো তাদের, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে তারা এগিয়েছে তাদের হিংস্রতার দিকে। তারা শুধু একা মুজিবকে হত্যা করে নি, তারা চেয়েছিলো মুজিবের রক্তের সমস্ত ধারা নিঃশেষ ক'রে দিতে। তাঁর পরিবারের কাউকে বাঁচতে দেয়া হয় নি; নগরের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দিয়ে হত্যা করেছে তাঁর আত্মীয়দের। খুনে তারা যে-দক্ষতা দেখিয়েছে, তার বীভৎসতা তুলনাহীন।

শেখ হাসিনা ও রেহানার ভাগ্য ভালো ও ট্র্যাজিক– তাঁরা তখন দেশে ছিলেন না। ঘাতকেরা মুজিবের রক্তধারা নিঃশেষ করতে পারে নি, তবে তার সম্ভাবনা যে নেই, এমন নয়।

সিজারও নিহত হয়েছিলো, তবে মুজিবের ঘাতকরা কোনো কাস্কা বা ব্রুটাস ছিলো না; গণতন্ত্রের জন্যে তাদের কোনো ব্যাকুলতা ছিলো না; তারা জানতো তারা ক্ষমতা দখল করতে পারবে না; তারা ছিলো ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপরায়ণ সুদক্ষ ঘাতক; তারা পরিকল্পনায় অদ্বিতীয়, আর তার বাস্তবায়নে হায়েনার থেকেও হিংস্র, বর্বরতায় বর্বরদের থেকেও বর্বর।

সিজারের আন্তোনি ছিলো, মুজিবের কোনো আন্তোনি ছিলো না; মুজিবের ছিলো একদল নির্বিবেক স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক।

সিজারের শব সামনে রেখে আন্তোনি জনগণের উদ্দেশে বলেছিলো :

বন্ধুগণ, রোমানগণ, দেশবাসীগণ, আপনারা আমার কথা একটু শুনুন; আমি সিজারকে সমাহিত করতে এসেছি, তাঁর প্রশংসা কারতে আসি নি। মানুষ যেসব অন্যায় করে, সেগুলো তার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে; শুধু ভালো কাজগুলো চাপা প'ড়ে যায় তাদের অস্থির সঙ্গে; সিজারের বেলাও তাই হোক। মহান ব্রুটাস আপনাদের বলেছেন যে সিজার ছিলেন উচ্চাভিলাষী। যদি তাই হয়ে থাকে, এটা ছিলো একটা নিদারুণ ত্রুটি; এবং নিদারুণভাবে সিজার তার ফল ভোগ করেছেন। এখানে, ব্রুটাস ও অন্যদের অনুমতি নিয়ে– কেননা ব্রুটাস একজন সম্মানিত ব্যক্তি; তাঁরা সবাই সম্মানিত ব্যক্তি– আমি সিজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দু-একটি কথা বলতে এসেছি। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, বিশ্বস্ত এবং আমার প্রতি সৎ; তবে ব্রুটাস বলেছেন তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, এবং ব্রুটাস একজন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি বহু বন্দীকে রোমে এনেছিলেন, যাদের পণের অর্থে বোঝাই হয়েছে সরকারি কোষাগার; সিজারের এ-কাজ কি তাঁর উচ্চাভিলাষের পরিচায়ক? যখন দরিদ্ররা হাহাকার করতো, সিজার কাঁদতেন তাদের সঙ্গে; উচ্চাভিলাষ সাধারণত কঠোর বস্তুতে গঠিত। তবু ব্রুটাস বলেছেন তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন, আর ব্রুটাস একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আপনারা সবাই দেখেছেন লিউপারকাল উৎসবে আমি তাঁকে তিনবার অর্পণ করেছিলাম একটি রাজকীয় মুকুট, যা তিনি তিনবার প্রত্যাখ্যন করেন। এটা কি ছিলো উচ্চাভিলাষ? তবু ব্রুটাস বলেছেন তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন; এবং অবশ্যই তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তি। ব্রুটাস যা বলেছেন আমি তা খণ্ডন করতে চাই না, তবে আমি যা জানি তা আমি এখানে বলবো। আপনারা একদা সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন, সেটা অকারণে নয়; তাহলে আজ কী কারণে আপনারা তাঁর জন্যে শোক করছেন না? হে ন্যায়, তুমি বাঁধা পড়েছো পাশব পশুদের কবলে, এবং মানুষেরা হারিয়ে ফেলেছে তাদের যুক্তিবোধ। একটু ধৈর্য ধ'রে আমার কথা শুনুন; আমার হৃদয় এখন ওই শবাধারে সিজারের সঙ্গে শায়িত, এবং আমাকে একটু থামতে হবে যতোক্ষণ না সেটি আমার কাছে ফিরে আসে।

...

তবে গতকালই সিজারের একটা কথায় কেঁপে উঠতো বিশ্ব : এখন তিনি প'ড়ে আছেন ওইখানে, এবং আজ এমন তুচ্ছ কেউ নেই যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে। হে ভদ্রমণ্ডলি, আমি যদি আপনাদের হৃদয় ও মনকে বিদ্রোহী ও ক্ষুব্ধ ক'রে তুলতাম, তাহলে আমি অন্যায় করতাম ব্রুটাসের প্রতি, এবং কাসিয়াসের প্রতি। তাঁরা, আপনারা সবাই জানেন, সম্মানিত ব্যক্তি। আমি তাঁদের প্রতি অন্যায় করবো না; এই সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি অন্যায় করার থেকে আমি বরং অন্যায় করবো ওই মৃতের প্রতি, আমার নিজের প্রতি, এবং আপনাদের প্রতি। তবে এখানে সিজারের মোহরাঙ্কিত একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে– আমি এটা পেয়েছি তাঁর সাক্ষাৎকারদান কক্ষে– এটা তাঁর ইচ্ছাপত্র। সাধারণ জনগণ এই ইচ্ছাপত্র শুনতে চাইবে, তবে আমাকে ক্ষমা করুন, আমি এটি পড়তে চাই না, এটা পড়লে তারা গিয়ে চুমো খাবে মৃত সিজারের ক্ষতগুলোতে এবং তাদের ন্যাপকিন সিক্ত করবে তাঁর পবিত্র রক্তে; হ্যাঁ, স্মৃতিরাখার জন্যে ভিক্ষে চাইবে সিজারের একেকটি চুল, এবং মৃত্যুর সময় তারা এটির কথা উল্লেখ করবে তাদের ইচ্ছাপত্রে, উইলে উল্লেখ ক'রে পরম উত্তরাধিকার হিশেবে রেখে যাবে সন্ততিদের জন্যে।

মুজিবের আন্তোনি ছিলো না, ছিলো কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকদল : খন্দকার মোশতাক, মোহাম্মদউল্লাহ, আবু সাঈদ চৌধুরী, ইউসুফ আলি, ফণিভূষণ

মজুমদার, সোহরাব হোসেন, আবদুল মান্নান, মনোরঞ্জন ধর, আবদুল মোমেন, আসাদুজ্জামান খান, এ আর মল্লিক, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, দেওয়ান ফরিদ গাজি, মোমেনউদ্দিন আহমদ, নুরুল ইসলাম, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মোসলেমউদ্দিন খান, ওবায়দুর রহমান, ক্ষীতিশ মণ্ডল, রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া, সৈয়দ আলতাফ হোসেন। এগুলোর অধিকাংশের নাম আমি তখনও জানতাম না, এখনও জানি না। এগুলোকে পোকামাকড়, নর্দমার কীট, ব'লেই মনে করতে পারি; তবে বাঙলায় পোকামাকড়ের, নর্দমার কীটের, অভাব কখনো হয় নি। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাতে ঘাতকেরা মুজিবকে সপরিবারে নিহত করার পর ওই দিনই এরা রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী হয়ে দেখিয়ে দেয় বাঙালি কতো কৃতঘ্ন হ'তে পারে।

তখনও বাঙলার বিশালতম লাশটি প'ড়ে ছিলো সিঁড়িতে।

বঙ্গীয় মানবিকতাহীনতার দুটি উদাহরণ রেখে গেছেন ওসমানি ও ভাসানি। ওসমানি হয়েছিলেন মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, আর ভাসানি ১৬ আগস্টে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মোশতাক সরকারকে, নতুন সরকারের জন্যে আল্লার কাছে মোনাজাতও করেছিলেন।

আল্লা সম্ভবত সব মোনাজাত শোনেন না।

মুজিব বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠা ক'রে, একটি মহান সংবিধান রচনা ক'রে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা করেন একদলীয় একনায়কত্ব; এবং তাঁর রক্তের ধারা একটি কথা বিশাল অক্ষরে লেখে যে গণতন্ত্র আমাদের জন্যে দুরাশা, খুবই সুদূর ব্যাপার। সেটা আমরা দেখতে থাকি দশকের পর দশক।

তিনি কি বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রে?

তিনি কি ভাবতে পারতেন তিনি বেঁচে আছেন, অথচ অন্য কেউ ও অন্য কোনো দল শাসন করছে দেশ?

আমরা নিজেদের যতোই বাঙালি বলি, ভেতরে ভেতরে আসলে তো আমরা মুসলমান; এবং মুসলমানদের পক্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার। কোনো মুসলমান রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র নেই; আছে নানা ধরনের একনায়ক, স্বৈরাচারী; তারা কোথাও রাজা, কোথাও রাষ্ট্রপতি, কোথাও তথাকথিত নির্বাচিত, যা চমৎকার কৌতুক।

বাকশাল তৈরি ক'রে মুজিব ধ্বংস করেন তাঁর সমস্ত অর্জন, ও নিজেকে; এবং বাঙলাদেশকে পথভ্রষ্ট করেন। আমরা যে-বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম, তা সৃষ্টি করার কথা ছিলো তাঁরই, কিন্তু তিনি তা করেন নি। তার ফলেই উদ্ভূত হয়েছে সামরিক স্বৈরশাসকেরা, যারা বাঙলাদেশকে পথভ্রষ্ট করতে করতে শোচনীয় পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে।

মুজিব, তাঁর পরিবার, ও তাঁর আত্মীয়বর্গের হত্যাকাণ্ডের পর বাঙলাদেশে রক্তকাণ্ডের উৎসব শুরু হয়।

আমাদের উচ্চারিত শ্লোগানগুলোতে 'রক্ত' সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ও সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে আমাদের শ্লোগানগুলো যেনো হিংস্র ক্ষিপ্ত কোনো পৌরাণিক দেবতার মতো তাণ্ডব শুরু করে বাঙলায়,– চিৎকার করতে থাকে, 'রক্ত চাই, আরো রক্ত চাই', এবং পান করতে থাকে রক্তপানীয়।

বাঙলাদেশ রক্তপান করতে থাকে; ফরাশি বিপ্লব যেমন পান করেছিলো তার সন্তানদের রক্ত, বাঙলাদেশও পান করতে থাকে তার সন্তানদের রক্ত।

আমরা এমন বাঙলাদেশ চাই নি।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাত থেকে ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বরের রাত পর্যন্ত ২ মাস ১৮ দিন বাঙলাদেশের ইতিহাসের 'খুনপর্ব'– হত্যার অধ্যায়। ঘাতকেরা প্রথম রাতেই সম্পন্ন করে তাদের প্রধান কর্মটি, ওই কাজের পর আর কোনো কাজই তাদের জন্যে অসম্ভব ছিলো না; তাদের আরো কাজ বাকি ছিলো– ৩ নভেম্বরে কেন্দ্রীয় কারাগারে তাদের অনুচর ঘাতকদের দিয়ে তারা সম্পন্ন করে তাদের শেষ প্রধান কর্মটি– খুন করে তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলি ও কামরুজ্জামানকে। এই আড়াই মাস বাঙালির নৃশংসতার মাস।

আরো খুন বাকি ছিলো, আরো খুনোখুনি বাকি ছিলো।

সেটি ঘটেছিলো বিভিন্ন সেনাপ্রধান ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে, জাসদের বিপ্লবীরাও যোগ দিয়েছিলো সুযোগের খোঁজে : ৭ নভেম্বরে নিহত হন খালেদ মোশাররফ। এবারও যিনি ভাগ্যবানরূপে দেখা দেন, তিনি মেজর জেনারেল জিয়া। কালুরঘাটের কিংবদন্তি এবার দেখা দেয় নতুন কিংবদন্তিরূপে। তিনি গৃহবন্দী ছিলেন, খালেদ মোশাররফের পরিণতি তাঁরও ঘটতে পারতো, কিন্তু তিনিই জয়ী হন।

এই জয়ও কালুরঘাটের মতোই আকস্মিক। মুজিবহত্যার সঙ্গে তিনি হয়তো জড়িত ছিলেন না, এ সম্পর্কে কেউ কিছু নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে না– নানা ভাষ্যকার নানা কথা বলেন, নানা সন্দেহ প্রকাশ করেন; তবে তিনিই সবচেয়ে বেশি সুফল উপভোগ করেন মুজিবহত্যার।

জিয়াকে কি বলতে পারি ঐতিহাসিক আকস্মিকতা, পরিস্থিতির ভাগ্যবান পুত্র? কিন্তু তাঁর জয়ের মধ্যেই কি নিহিত ছিলো পতনের বীজ? সেদিনই কি নিয়তি ঠিক ক'রে ফেলেছিলো তাঁর ট্র্যাজিক পরিণতি? এটা কি ট্র্যাজিক ছিলো? বিয়োগান্তক ছিলো? না কি ছিলো অবধারিত?

জিয়া জয়ী হয়েছিলেন, তবে যে-প্রক্রিয়া তাঁকে জয়ী করেছিলো, তা কারো বুকে শান্তি যোগাতে পারে না, বুকের ভেতর ভয় জেগেই থাকে।

তাঁর প্রধান ভয় ছিলো তাঁর বাহিনীকেই। তাঁর হাত রক্তে রঞ্জিত ছিলো। বিভ্রান্ত বিপ্লবী কর্নেল তাহের, যিনি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন জিয়াকে, তাঁকেও নির্দ্বিধায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন জিয়া, এবং তাহের কারাগারে দেয়া বক্তব্যে জিয়াকে আখ্যা দিয়েছিলেন, 'বাঙলাদেশের নতুন মীরজাফর' ব'লে। ম্যাসক্যারেনহ্যাস *বাঙলাদেশ : এ লেগ্যাসি অফ ব্লাড*-এ জানিয়েছেন, 'উপমহাদেশের ইতিহাসে জিয়ার মতো আর কোনো জেনারেল তাঁর নিজের সৈনিকদের এতো নির্বিচারে হত্যা করেন নি।' লরেন্স জিরিং *বাঙলাদেশ : ফ্রম মুজিব টু এরশাদ, অ্যান ইন্টারপ্রেটিভ স্টাডি* বইটিতে বলেছেন, 'বলা হয় যে শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথের মতো জিয়ার হাত রক্তে এতো রঞ্জিত ওঠে যে তাঁর এগিয়ে যাওয়া ছিলো পিছিয়ে যাওয়ার মতোই কঠিন, এবং পিছিয়ে যাওয়ার অর্থ ছিলো আত্মসমর্পণ করা, যা আর না করার জন্যে জিয়া ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

জিয়া ক্ষমতায় এসেছিলেন উৎপ্লবমত্ত পরিস্থিতির ঢেউয়ে চ'ড়ে।

মুজিবের ঘাতকেরা ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট খন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতির পদে বসায়। খন্দকার মোশতাক একজন চক্রান্তকারী হিশেবে আগে থেকেই কুখ্যাত ছিলো, যদিও মুজিব তাকে বিশ্বাস করতেন; মোশতাক রাষ্ট্রপতি হওয়ায় সন্দেহ থাকে না যে সে-ই প্রধান চক্রান্তকারী। লরেন্স লিফশুল্টস্ *বাঙলাদেশ : দি আনফিনিশ্ড় রেভোলিউশন*-এ জানিয়েছেন বছরখানেক আগেই মোশতাক মুজিবের পতনের চক্রান্ত করেছিলো। বাঙলাদেশে সে এখন সবচেয়ে নিন্দিত নাম।

তবে সে বেশি দিন টিকতে পারে নি, ক্ষমতায় ছিলো মাত্র ৮২ দিন।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্তটা সময়টি ছিলো অরাজকতাপর্ব, কয়েকজন কর্নেল-মেজর নিজেদের বন্দুকের নলের সামনে অসহায় ক'রে রেখেছিলো একটি সম্পূর্ণ দেশকে। তখন রাজনীতিকেরা দেখিয়েছে বিশ্বাসঘাতকতা আর সেনাপ্রধানেরা মেরুদণ্ডহীনতা।

৩ নভেম্বরে একটি অভ্যুত্থান ঘটান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা, কর্নেল হায়দার। এর পেছনে কোনো আদর্শ ছিলো না, ছিলো নিজেদের পদ রক্ষা করা। কিন্তু পদ রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা বিসর্জন দেন প্রাণ। তাঁরা বঙ্গভবন, যেখানে ছিলো মোশতাক ও ঘাতক মেজররা, অবরোধ করেন, বেতারকেন্দ্র অধিকার করেন, এমনকি সেনাবাহিনীপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়ার ভবন ঘিরে ফেলেন। কিন্তু তাঁরা দক্ষ ছিলেন না।

তাঁদের থেকে অনেক দক্ষ ছিলো ঘাতক কর্নেল-মেজররা ও মোশতাক, তাই করুণ পরিণতি বরণ ক'রে নিতে হয় খালেদকে। কর্নেল-মেজররা ৩ নভেম্বরের রাতেই নির্মম দক্ষতার সঙ্গে কেন্দ্রীয় কারাগারে খুনের ব্যবস্থা

করে আওয়ামি লিগের চারজন নেতার; আর খালেদ অর্জন করেন শুধু বেতারকেন্দ্র থেকে একটি ঘোষণা করানোর সাফল্য। ৪ তারিখের মধ্যরাতে বেতারের একটি জরুরি ঘোষণায় বলা হয় জেনারেল জিয়া পদত্যাগ করেছেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন, এবং ৩ নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি খালেদকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত ক'রে তাঁকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করেছেন।

এটুকু সাফল্য, আর এই সাফল্য, যার সঙ্গে ছিলো না বিশেষ সক্রিয়তা, তাই কাল হয়ে ওঠে খালেদের জন্যে। তাঁর থেকে অন্য সবাই ছিলো ধুরন্ধর, চক্রান্তকুশল, ঘাতকরা তো ছিলো অশেষ দক্ষ। তারা ২৯ জন খালেদকে ব্যবহার ক'রেই ৩ নভেম্বরের রাতে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যায়, তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাও ক'রে যায়। পরিস্থিতিকে তারা কতোটা নিয়ন্ত্রিত করেছিলো এ থেকেই তা বোঝা যায়। কারাগারে যে চারজন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে, তাও সবাই জেনেছে ঘাতক কর্নেল-মেজররা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর।

খন্দকার মোশতাকের দিনও শেষ হয়ে আসে। খালেদ ও তাঁর বাহিনী মোশতাককে আর ক্ষমতায় রাখতে চান না। তারা ৫ নভেম্বরে প্রধান বিচারপতি সায়েমকে নিয়ে আসে বঙ্গভবনে; এবং ৬ নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি হন সায়েম। আমাদের দেশে প্রধান বিচারপতিদের প্রায় দেবতা মনে করা হয়, কিন্তু তাঁরা সাধারণত এর বিপরীত ভূমিকা পালন করেন।

আমাদের প্রধান বিচারপতিরা ক্ষমতাব্যগ্র; সেনাপতিরা ক্ষমতা দখল করলেই তাঁরা প্রস্তুত হন প্রেসিডেন্ট, ও সিএমএলএ হওয়ার জন্যে। প্রথমে একটু ভদ্রতা দেখান, অনিচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু পরে পদগুলো নিয়ে পরিণত হন সেনাপতিদের দাসে। সেনাপতিরা তাঁদের দিয়ে কাজের পর কাজ করিয়ে এক সময় তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরাই হয় প্রেসিডেন্ট, দেশের রক্ষাকর্তা, জাতির ত্রাতা, গণতন্ত্রের জনক।

প্রধান বিচারপতিদের কাজ যেখানে দেশের সংবিধান ও জনগণের অধিকার রক্ষা করা, তাঁরা সেখানে হয়ে ওঠেন জেনারেলদের আজ্ঞাবহ; শোচনীয়ভাবে তাঁরা সেবা করেন সেনাপতিদের। সেনাপতিরা তাঁদের ভৃত্যের মতোই ব্যবহার করে; তবু তাঁরা মনে করেন তাঁরা প্রেসিডেন্ট, তাঁরা রাষ্ট্রপতি। এতে তাঁরা বেশ সুখ পান; তাঁরা প্রচুর প্রচার পান, অজস্র ছবি ছাপা হয় তাঁদের, নানা ভোজের আয়োজন করেন, এবং পরে বঙ্গভবনে ঝুলতে থাকে তাঁদের সুন্দরভাবে বাঁধাই করা একটি ছবি।

খালেদ মশাররফ দক্ষ ছিলেন না, আর তাঁকে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য মেনেও নেয় নি। বাঙলাদেশ ও বাঙলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী তখন কতোটা রুশ-ভারতবিরোধী হয়ে উঠেছিলো, তার পরিচয় অবিলম্বে পাওয়া

যায়। রটিয়ে দেয়া হয় যে খালেদ রুশ-ভারতপন্থি। পত্রিকায় ছাপা হয় মুজিবের বাড়ির দিকে যাত্রী একটি মিছিলের ছবি, যাতে ছিলেন খালেদের মা ও ভাই। এটাই কাজ করে তাঁর বিপক্ষে, তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে; তিনি পরিচিত হন রুশ-ভারতের দালালরূপে।

রুশ-ভারতের দালাল? অথচ মাত্র চার বছর আগে এই রুশ-ভারতই বাঙলাদেশকে সাহায্য করেছিলো স্বাধীন হ'তে।

কর্নেল তাহের, যিনি তখন হয়ে উঠেছিলেন বিভ্রান্ত বিপ্লবী, ও জাসদ উঠে প'ড়ে লাগে খালেদের বিরুদ্ধে।

৬ নভেম্বরে সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে খালেদের বিরুদ্ধে; ৭ নভেম্বরে নিহত হন খালেদ, হুদা ও হায়দার।

সৈনিকেরা যে দলবলে এসে, প্রচণ্ড লড়াই ক'রে, তাঁদের হত্যা করেছিলো, এমন নয়; এক কোম্পানি কম্যান্ডারের কক্ষে দুজন ক্যাপ্টেন তাঁদের গুলি ক'রে হত্যা করে। পরিহাস হচ্ছে এ-দুই ক্যাপ্টেনকে রংপুর থেকে আনা হয়েছিলো খালেদের শক্তি বাড়ানোর জন্যেই।

তখন আবার ভাগ্যবানরূপে দেখা দেন জেনারেল জিয়া, বন্দীত্ব থেকে উদ্ধার ক'রে সৈনিক-জনতা তাঁকে বরণ ক'রে নেয় সেনাপ্রধানরূপে।

মোশতাককে আবার রাষ্ট্রপতি করার উদ্যোগও নেয়া হয়েছিলো, তবে তা সফল হয় নি। এটাও ভালো হয়েছিলো জিয়ার জন্যে; মোশতাকের সঙ্গে থাকলে মুজিবহত্যার কালিমা তাঁকেও বহন করতে হতো, এবং মোশতাক কখন কী খেলা খেলতো তা কেউ বলতে পারে না।

জিয়াকে উদ্ধারে ভূমিকা পালন করেছিলেন কর্নেল তাহের; এবং জিয়া তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে (২০ জুলাই ১৯৭৬)।

জিয়া মুক্ত হয়ে যেদিন আবার সেনাপ্রধান হন, সেদিনই বাঙলাদেশে দেখা দেয় একজন সামরিক একনায়ক, জিয়া দেখতে পান ভবিষ্যৎ ও বাঙলাদেশ তাঁর জন্যে খোলা– তিনি যা কিছু দেখছেন, তিনি সে-সবের অধিপতি। তিনি ছিলেন একজন পেশাদার, কর্কশ, কঠোর, পাকিস্তানি মেজর, রাষ্ট্রপতির পদ তাঁর লক্ষ্য না হয়ে পারে না।

এডিনবরায় আমার পরিচয় হয়েছিলো এক পাকিস্তানি যুবকের সঙ্গে।

সে একদিন বললো, আমি তিনবার পাকিস্তান আর্মিতে ঢোকার জন্যে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, ঢুকতে পারলে না কেনো?

সে বললো, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতো, 'তুমি আর্মিতে ঢুকতে চাও কেনো', আমি বলতাম, 'আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হ'তে চাই'।

আর্মিতে ঢোকাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সহজ পথ।

জিয়া পরে যতোই 'বাঙলাদেশি' জাতীয়তাবাদ প্রচার ও বাঙালিকে বাঙালিত্ব ভোলানোর চেষ্টা করুন না কেনো, তিনি তো ছিলেন বাঙালি; তাঁর পক্ষে পাকিস্তানে জেনারেল জিয়া, সিএমএলএ, প্রেসিডেন্ট হওয়া কখনোই সম্ভব হতো না, সেখানে অন্য জিয়ারা ছিলো; তিনি হ'তে পারতেন বড়ো জোর ফুল কর্নেল, যেমন হয়েছিলেন ওসমানি।

তাঁর সহজাত উচ্চাভিলাষ ছিলো, সেটা থাকা ভালো; উচ্চাভিলাষই মানুষকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করে।

১৯৭১-এর ২৭ মার্চে কালুরঘাটে তিনি প্রথমে নিজেকে স্বাধীন বাঙলার সরকারপ্রধান হিশেবে ঘোষণা ক'রে বসেছিলেন; বেতারকর্মীরা তাঁর ওই ঘোষণা মেনে নেন নি; তাঁদের চাপে জিয়া ওই ঘোষণা সংশোধন ক'রে আবার ঘোষণা দেন। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরেও মুক্ত হওয়ার পর প্রথম ঘোষণায় তিনি নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিশেবে ঘোষণা করেন; পরে তা সংশোধন ক'রে বিন্যস্ত হন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকরূপে। এটাও শুভ হয় তাঁর জন্যে।

জিয়া জানতেন তিনিই সব, রাষ্ট্রপতি সায়েম তাঁর ক্রীড়নক, খেলার পুতুল, একটি কাকতাড়ুয়া মাত্র, খড়কুটোর মানুষ; তাঁকে দিয়ে খেলাতে হবে, তাঁকে দাসরূপে ব্যবহার করতে হবে।

সামরিক একনায়কেরা এ-কাজ করে সব সময়ই। আমাদের দেশে এটাই সামরিক একনায়কদের প্রতিষ্ঠার ব্যাকরণ।

জিয়া সায়েমকে নিঃশেষে ব্যবহার করেন তাঁর 'ব্যাটম্যান'রূপে।

জিয়াকে আমি কখনো কাছে থেকে দেখি নি, দূর থেকেও দেখি নি। কোনো নেতাকেই আমি কাছে থেকে দেখি নি, দেখার কোনো আগ্রহ হয় নি, আর সামরিক একনায়কদের দেখার আগ্রহ জাগার কথাই ওঠে না। জিয়াকে আমি যতোটুকু দেখেছি, তার সবটাই ছবিতে ও টেলিভিশনে। তাঁর থেকে তাঁর কালো সানগ্লাসই আমার চোখে বেশি পড়েছে। তাঁর সব ভঙ্গিই ছিলো একনায়কের, প্রভুর, স্বাভাবিক মানবিক হাসি তাঁর মুখে কখনো দেখি নি। জনদরদীর ভূমিকায় তিনি ফটোগ্রাফারদের সামনে যতো পোজ দিয়েছেন, তার একটিতেও তিনি জনগণের হয়ে ওঠেন নি; রয়ে গেছেন সামরিক বাহিনীরই। তিনি যতো উপদেষ্টা ও মন্ত্রী নিয়েছিলেন, তারা তাঁর সামনে ব'সে থাকলেও মনে হতো দাঁড়িয়ে আছে। শোনা যায় বুড়ো বুড়ো উপদেষ্টাদের তিনি দাঁড় করিয়ে রাখতেন, বসতে বলতেন না। বেশ করেছেন তিনি, ওগুলো ক্লাশের দুষ্ট ছেলে ছিলো না, ছিলো দেশেরই নষ্ট বুড়ো; ওগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখাই দরকার ছিলো।

সায়েম যে-একটি তুচ্ছ বই লিখেছেন *অ্যাট বঙ্গভবন : লাস্ট ফেইজ* নামে, তাতে বিদেশি দূত ও গণ্যমান্যদের সম্মানে আয়োজিত একটি

পার্টিতে সায়েমের সঙ্গে জিয়ার করমর্দনরত একটি ছবি আছে, 8 ডিসেম্বর ১৯৭৫-এর। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সায়েম করমর্দন করছেন শাদা/ক্রিম রঙের স্যুট ও কালো সানগ্লাসে সুসজ্জিত ডিসিএমএলএ জিয়ার সঙ্গে, সেটা এক দর্শনীয় দৃশ্য, জিয়া নিচের দিকে তাকিয়ে আছেন রহস্যময় ভঙ্গিতে, আর সায়েম যেনো তাঁর হাত ধরতে পেরে ধন্য বোধ করছেন।

এক কৃপাপ্রার্থী বুড়ো ভৃত্য ধ'রে আছে মনিবের হাত।

তবু সায়েম মনে করেছেন তিনি প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ!

জিয়া সায়েমকে ব্যবহার করেছেন এক শোচনীয় দাস ও বিদূষকরূপে। এতে জিয়ার কোনো দোষ নেই– তিনি কখনো দাবি করেন নি যে তিনি জর্জ ওয়াশিংটন–, একদা প্রধান বিচারপতি যদি দাস ও ভাঁড় হ'তে চায়, তাহলে সেনাপতি কী করতে পারে? দাসকে দাস আর ভাঁড়কে ভাঁড়রূপে খাটানোই সর্বোত্তম। আমাদের মতো দরিদ্র ও আত্মসম্মানবোধহীন লোভীদের দেশে দাস, দালাল, ভাঁড় পাওয়া খুবই সহজ। জিয়াও ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে দাস, দালাল, ভাঁড় পেয়েছিলেন। কে পায় নি? আইউব থেকে শুরু ক'রে এরশাদ পর্যন্ত?

যিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি, তিনি কী ক'রে হন 'সিএমএলএ' বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক?

এটা যে তাঁর জন্যে ধিক্কারের, তা তিনি বোঝেন নি, বরং একে তিনি মনে করেছেন মুকুট, যাত্রাভিনয়ে যেমন রাজারা পরে রাংতার মুকুট।

এটাই শেষ নয়, আরো বাকি ছিলো। পরমানন্দে তিনি জলপাইরঙের পোশাক প'রে ঘুরেছেন দেশ জুড়ে, বিদেশে নানা সম্মেলনেও যোগ দিয়েছেন এই চমকপ্রদ শীতল সামরিক পোশাক প'রে। আমরা এ-অপরূপ রূপ দেখে সুখ পেয়েছি; বহু দিন সার্কাস ও ক্লাউন দেখি নি; সায়েম সেটা দেখার আনন্দ যুগিয়েছিলেন। ভানুও যা পারতেন না, তা পেরেছিলেন প্রধান বিচারপতি সায়েম। কিন্তু তিনি বলতে ভালোবাসতেন তাঁর কোনো লোভ নেই, তাঁর একটি মাত্র মেয়ে, এ নিয়েই তিনি সুখে থাকতে চান!

তবে তিনি সুখ পেয়েছিলেন জেনারেল জিয়ার দাস ও ভাঁড় হয়ে।

জিয়াকে কোনো দোষ দিই না, তাঁর সেই প্রতিভা ছিলো, যা প্রধান বিচারপতিকে দাসে ও ভাঁড়ে পরিণত করে।

সায়েমের *অ্যাট বঙ্গভবন : লাস্ট ফেইজ* বইটি তাঁরই মতো তুচ্ছ, মনে হয় এক নির্বোধের লেখা।

তিনি যে কেউ নন, নিতান্তই ক্রীড়নক, এটা তিনি শুরুতে বোঝেন নি। তিনি এটা বুঝতে শুরু করেন বঙ্গভবনে তাঁর শেষের দিনগুলোতে।

বুঝতে পারেন তিনি অথর্ব অক্ষম হয়ে পড়ছেন, কিন্তু তিনি যে শুরু থেকেই ছিলেন অথর্ব অক্ষম আজ্ঞাবহ ক্রীড়নক, তাঁকে আলুর বস্তার মতো ধ'রে এনে বানানো হয়েছিলো প্রেসিডেন্ট, তা মূর্খ জনগণও বুঝেছিলো, কিন্তু প্রধান বিচারপতি, 'তিনি সম্মানিত ব্যক্তি', তিনি তা বোঝেন নি।

তিনি যে অথর্ব অক্ষম হয়ে পড়ছিলেন, এর জন্যে তিনি জিয়াকে দোষ দেন নি, সেনাপতিদের দোষ দেন নি, দোষ দিয়েছেন রাজনীতিবিদদের, আমলাদের, উপদেষ্টাদের, এবং বিশেষ ক'রে বিচারপতি সাত্তারকে। এ-বিচারপতিটিকে তিনিই নিয়োগ করেছিলেন তাঁর বিশেষ সহকারী হিশেবে, এবং এঁকেই তিনি বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশি। আমরা গরিবরা তো জানিই, শেষে সায়েমও বুঝতে পারছিলেন বিচারপতিরা কী জিনিশ।

সায়েম বলেছেন, তিনিই নিয়োগ করেছিলেন ডিসিএমএলএদের, তিন বাহিনীর প্রধানদের। তিনি বোঝেন নি যে তাঁরাই নিয়োগ করেছিলেন তাঁকে। তিনি বলেছেন তাঁর উপদেষ্টারাই চাইতো না যে রাজনীতিবিদেরা ক্ষমতায় আসুক। তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে ছেড়ে সেনানিবাসে দৌড়োতে থাকতো– জিয়ার কাছে; তারা জানতো জিয়াই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। এ-দৌড়োনোর প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন বিচারপতি সাত্তার, যিনি পরে দৌড়োনোর পদক পেয়েছিলেন।

দেশে কতো মাননীয় উপদেষ্টা আর মন্ত্রী এসেছে আর গেছে, কে তাদের নাম মনে রাখে? কারা তাঁর উপদেষ্টা ছিলো? একদল স্বার্থপর। তারা কেনো গণতন্ত্র চাইবে? সামরিক শাসন থাকলে তারা কিছু-না-কিছু পাবে, গণতন্ত্রে কিছুই পাবে না। যে-দেশের রাজনীতিবিদেরা, আমলারা, বিচারপতিরা, উচ্চপদস্থরা লোভী, দুষ্ট, আত্মমর্যাদা ও নীতিবোধহীন, সেখানে কী ক'রে মানুষ পেতে পারে অধিকার ও গণতন্ত্র?

সেনাপতিরা সেখানে একদিন দেখা দেবেই ত্রাতারূপে।

সায়েম বলেছেন, সশস্ত্রবাহিনী মানেই সেনাবাহিনী।

আর জিয়াই তখন ছিলেন সর্বশক্তিমান, এবং তিনি এগোতে থাকেন তাঁর লক্ষ্যের দিকে। জিয়া বুড়োকে ব্যবহার ক'রে গ'ড়ে তুলতে থাকেন তাঁর নতুন ভাবমূর্তি, ত্রাতার ভাবমূর্তি। সায়েম তাঁর বইতে বারবার বলেন, আমি এটা করি, ওটা করি; কিন্তু ওগুলো যে তাঁকে দিয়ে করানো হচ্ছিলো, তা স্বীকার করতে তিনি লজ্জা পেয়েছেন, বা বুঝতে পারেন নি।

সায়েম বলেছেন, ১৯৭৬-এর ২৯ নভেম্বরে তিনি উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব ছেড়ে দেন।

তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন? তিনি সত্য বলছেন? আমরা বুঝি তিনি ছেড়ে দেন নি, তাঁকে ওই দায়িত্বটি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, ছেড়ে

না দেয়ার শক্তি তাঁর ছিলো না।

সায়েম বলেছেন, ১৯৭৭-এর ২১ এপ্রিলে বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে একদল অসামরিক উপদেষ্টা তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদটি ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করে। তারা সায়েমকে বলে যে তারা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের অধীনেই কাজ বা সেবা করতে চায়।

সায়েম পদটি হারানোর কথা ভেবে একটু হাহাকার ক'রে বলেন, এটা কি প্রমাণ করে না যে অসামরিক উচ্চপদস্থরাও সেবা করতে চায় সেনাপতিদের? হঠাৎ তাঁর চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু কথা হচ্ছে দেড় বছর ধ'রে তাহলে তিনি নিজে কী ক'রে আসছিলেন?

সায়েম বলেছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর কি নিজের সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো সুযোগ ছিলো? তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাঁর কাজ ছিলো নির্দেশ পালন; সিজার কিছু বলার আগেই তা প্রতিপালিত হওয়াই স্বর্গীয় নীতি।

যেদিন তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিলো, সেদিনই, ১৯৭৭-এর ২১ এপ্রিল, সায়েম পদত্যাগ করেন, এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান শপথ নেন বাঙলাদেশের সপ্তম রাষ্ট্রপতি হিশেবে, ৪৩ বছর বয়সে।

একদা প্রধান বিচারপতি, তারপর প্রেসিডেন্ট, সিএমএলএ, সায়েমকে কেনো মিথ্যে কথা ব'লে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো? জিয়ার হাতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণের সময় তিনি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ ছিলেন না।

প্রধান বিচারপতির কাছে মানুষ কি শিখবে মিথ্যে বলতে, যাঁর কাছে মানুষ সত্য বলার শপথ নেয়? ১৯৮৮ সালে *অ্যাট বঙ্গভবন : লাস্ট ফেইজ* বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, তাঁর ইচ্ছে ছিলো বইটি বেরোবে তাঁর মৃত্যুর পরে, কিন্তু অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের ১১ বছর পরও মৃত্যুও যেহেতু তাঁকে প্রয়োজনীয় মনে করছিলো না, তাই বইটি তিনি ছাপেন। আরো একটি কারণ ছিলো : তিনি তখন নিরাপদ, এর অনেক আগেই জিয়া তাঁর পরিণতিতে পৌঁছে গেছেন, এবং আরেক সামরিক একনায়ক দেশ দখল ক'রে বসেছে।

জিয়া সামরিক একনায়কদের ব্যাকরণ অনুসারে ক্ষমতা দখল করেন, ওই ব্যাকরণ অনুসারে বাঙলাদেশকে শাসন করেন, এবং ওই ব্যাকরণ অনুসারেই গন্তব্যে পৌঁছে অমরতা লাভ করেন।

তিনি ছিলেন সামরিক স্বৈরশাসক, একনায়ক, ছোটো মাপের, আইউব খাঁর মিনিসংস্করণ; এবং টিঁকে থাকার জন্যে তিনি নেন অজস্র কৌশল। তাঁর ভয় ছিলো তাঁর সেনাবাহিনীকেই,– জনগণকে ভয় পাওয়ার দিন তাঁর তখনো আসে নি, কোনো একনায়ককেই জনগণ চিরকালের জন্যে মেনে

নেয় না– এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশই তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

জিরিং তাঁর *বাঙলাদেশ : ফ্রম মুজিব টু এরশাদ* বইতে জানিয়েছেন জিয়ার বিরুদ্ধে কমপক্ষে ২৬টি অভ্যুত্থান ঘটেছিলো; তিনি তার সবগুলো রক্তে রাঙিয়ে দমন করেন। জিয়ার মতো রক্তাক্ত হাত আর কারো ছিলো না। কিন্তু শেষটিকে দমাতে পারেন নি। মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে তিনি ভয় করতেন, তাঁকে নিষ্ক্রিয় করার সব ধরনের উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন, তাঁকে যতোদূর সম্ভব দূরে রাখতেন। জিয়া এরশাদকে সেনাবাহিনীর ভার দিয়ে মঞ্জুরকে পাঠিয়ে দেন চট্টগ্রামে। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি বিশ্বাস করতেন না, বিশ্বাস করতেন পাকিস্তান থেকে ফেরা এরশাদের মতো দুষ্টদের। মঞ্জুরকে চট্টগ্রামে পাঠিয়েও তিনি স্বস্তিতে ছিলেন না, তাই তাঁকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করার জন্যে নিয়োগ করেন নতুন প্রতিষ্ঠিত স্টাফ কলেজের পরিচালকের পদে। মঞ্জুরের আর সময় ছিলো না। ১৯৮১ সালের ৩০ মে-তে জিয়া চট্টগ্রামে গেলে মঞ্জুর আঘাত করেন, আর এর ফলে ধ্বংস হয়ে যান জিয়া ও মঞ্জুর দুজনেই।

জিয়ার লাশও হয়ে ওঠে কিংবদন্তি; তাঁর লাশ আর কেউ দেখে নি।

১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর থেকে ১৯৮১র ৩০ মে পর্যন্ত, সাড়ে ৫ বছরে, তিনি বাঙলাদেশের মুখটিকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি দেশটিকে প্রতিক্রিয়াশীলতায় দীক্ষিত করেছেন। বাঙলাদেশ এখনো চলছে পেছনের দিকেই, প্রতিক্রিয়াশীলতার ভেতর দিয়ে।

জিয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মেজর ছিলেন, জীবনের প্রস্তুতিপর্বটি কেটেছে তাঁর পাকিস্তানে, বাঙলাও তিনি ঠিকমতো বলতে পারতেন না, এবং তাঁর আদর্শকাঠামো ছিলো আইউব খাঁ।

আইউব খাঁ অবশ্য সায়েমের মতো কোনো খড়কুটোকে ব্যবহার করে নি; কিন্তু জিয়া এগোতে থাকেন আইউব খাঁর মতোই।

বাঙালি মুসলমান অবশ্য একটি অদ্ভুত জাতি; তারা একনায়কের মহিমায় মুগ্ধ হ'তে পারে– আইউব তাদের সম্মোহিত করেছিলো, আবার একনায়কদের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রে রক্তও দিতে পারে।

অস্ত্র দিয়ে রাষ্ট্র দখল করতে পারলে অনেক দিন চালানো যায়। দখল করাটাই কঠিন, চালানোটা ততো কঠিন নয়। সামরিক অভ্যুত্থানকারীরা জয়ী হ'লে হয় ত্রাতা, পরাজিত হ'লে হয় রাষ্ট্রদ্রোহী।

জিয়া অভ্যুত্থান করেন নি– তাঁর হয়তো পরোক্ষ আশীর্বাদ ছিলো ঘাতক কর্নেল-মেজরদের প্রতি, কিন্তু তার সমস্ত সুফল ভোগ করেন তিনি, এবং একদিন ঐতিহাসিকভাবে গন্তব্যে উপনীত হন; তবে তাঁর সাফল্য তিনি একটি রাজনীতিক দল ও একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা ক'রে যান।

এর জন্যে দায়ী মুজিব, ও তাঁর স্বার্থপর দল, দায়ী মুজিবের

বিশ্বাসাঘাতক দুর্বৃত্তরা।

জিয়া সামরিক একনায়কদের ব্যাকরণ মেনে শাসন করেন বাঙলাদেশ।

বাঙলাদেশ এক দালালদের দেশ যেখানে জিয়ার দালালের অভাব হয় নি; বরং দালালের প্রাচুর্যই তাঁকে বিব্রত করে।

সামরিক একনায়কদের দেশদখল ও সেটাকে বৈধ করার একটি সূত্র হচ্ছে গণভোট। গণভোটে প্রার্থী থাকে একজন সামরিক একনায়ক, সে কতকগুলো কর্মসূচি প্রস্তাব করে, এবং জনগণকে বলা হয় 'হ্যাঁ'/'না' ভোট দেয়ার জন্যে। জনগণের ভোট দেয়ার দরকার পড়ে না, একনায়কের পাণ্ডারাই একনায়কের নির্দেশে একনায়কের বাক্সে ভোটের পাহাড় গড়ার ব্যবস্থা করে। ১৯৭৭-এর ২১ এপ্রিলে জিয়া সায়েমের কাছে থেকে ক্ষমতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট হন, ৩০ মে এক গণভোটের আয়োজন করেন।

কিসের ওপর গণভোট? জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির ওপর।

তাঁর অসামান্য কর্মসূচিগুলোর কথা আজ আর কারো মনে নেই।

আমার মনে আছে শুধু তাঁর কোদালচর্চার কথা। তিনি কোদালপ্রেমিক ছিলেন, যেখানেই যেতেন সঙ্গে কোদাল নিয়ে যেতেন; এবং খাল কাটতেন। ওটা হয়ে উঠেছিলো কোদালশিল্পকলা, একটি আর্ট, তাঁর সময়টিকে কোদালশিল্পের কালও বলা যায়। সভ্যতার ইতিহাসে কোদাল কখনো এতোটা গৌরব পায় নি। আমলারা তখন কামলা হয়ে উঠেছিলো, সব সময়ই তারা কামলা; তারা সাফারি প'রে নিয়মিতভাবে মাটি কাটতো, স্বপ্নেও হয়তো তারা চালাতো সোনালি কোদাল। আমলাদের মাটি কাটার দৃশ্য টেলিভিশনে রঙিন দেখতো।

জিয়ার সময়ই বাঙলাদেশে টেলিভিশন রঙিন হয়ে ওঠে; আমাদের দারিদ্র্য ও কোদালশিল্পকে অপূর্ব রঙিন দেখাতে থাকে। তাঁর ১৯ দফার রঙিন রূপ দেখে জনগণ মুগ্ধ হয়।

মূল ব্যাপার ছিলো গণভোট। এ-ধরনের গণভোট হচ্ছে জঘন্য অবৈধকে বৈধ করার একটি রীতি, যাতে ব্যয় হয় রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ, এবং দুশ্চরিত্র করা হয় আমলা ও জনগণকে।

এটা এক ঘৃণ্য কাজ, কিন্তু জনগণের করার কিছুই থাকে না।

গণভোটের দিন ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও আমি কয়েকটি কেন্দ্রে গিয়েছিলাম ভোট দেয়ার দৃশ্য দেখার জন্যে; কোনো কেন্দ্রেই ২০/৩০ জনের বেশি লোক ছিলো না। কিন্তু ৩১ মে নির্বাচন কমিশন গণভোটের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করে যে জিয়ার পক্ষে ৯৮.৮৭% ভোট পড়েছে। এতে জেনারেলের দুঃখ পাওয়ারই কথা, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা করা উচিত ছিলো যে তাঁর পক্ষে ১০০% ভোট পড়েছে, এবং ১০০% ভোটার ভোট দিয়েছে। একনায়কেরা এর থেকে কম ভোটে সুখ পায় না, যেমন

মাসখানেক আগে (২০০২) একনায়ক সাদ্দামের পক্ষে ১০০% ভোটার ১০০% ভোট দিয়েছে।

এটা ছিলো এক মহাকেলেঙ্কারি, কিন্তু সামরিক একনায়কের বিপক্ষে কে কথা বলবে? তাদের মতো কে আর জনপ্রিয়?

আমি অবশ্য জিয়াকে দোষ দিই না; দিই শেখ মুজিবকে। জিয়ার কাছে আমার ও জাতির কোনো প্রত্যাশা ছিলো না, প্রত্যাশা ছিলো মুজিবের কাছে। মুজিব প্রত্যাশা পূরণ করেন নি ব'লেই, তিনি জাতির স্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছিলেন ব'লেই তো দেখা দিয়েছিলেন জিয়া।

জিয়ার কাছে চাইতে পারি না যে তিনি হবেন জর্জ ওয়াশিংটন।

জিয়া যা, তাই হয়েছিলেন– মিনি আইউব খাঁ।

সামরিক একনায়কেরা দেখা দেয় দেবদূতের মতো, এমনকি ইয়াহিয়ার মতো খুনিকেও মনে হয় জেসাস ক্রাইস্ট। তারা বলে, দেশকে উদ্ধারের জন্যেই তারা দায়িত্বভার নিয়েছে, তাদের কোনো ক্ষমতার লোভ নেই, সৈনিক থাকতেই তারা পছন্দ করে, যথাসময়ে তারা জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আবার সেনানিবাসে ফিরে যাবে। যথাসময়টি আর আসে না। বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে যে-অবস্থা হয় ব'লে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেনাপতিরা একবার ক্ষমতার স্বাদ পেলে হয় একই অবস্থা। ক্ষমতা খুবই সুস্বাদু– রক্ত ও নারীমাংসের থেকেও। ক্ষমতা ছেড়ে আর যেতে মন চায় না।

তারা প্রথমে গণভোটে জেতে, তারপর দেশের সমস্ত দালালদের নিজের বুটের নিচে জড়ো করে, একটি রাজনীতিক দল গঠন করে, এবং একটি 'সুষ্ঠু নির্বাচন' আয়োজন ক'রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে উর্দি খুলে স্যুট প'রে জনগণের পক্ষে নিজের বাঁ হাত থেকে ডান হাতে গ্রহণ করে ক্ষমতা। জনগণ ক্ষমতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি ফিরে পেয়ে ধন্য হয়। তারা প্রেসিডেন্টের নামে সর্বশক্তিমান একনায়ক হয়ে বসে। তারা সৃষ্টি করে তাদের ভাবমূর্তি, বীরপুজোয় মাতিয়ে তোলে দেশকে।

জেনারেল জিয়া গ্রহণ করেন জেনারেলদের একই ধ্রুপদী পদ্ধতি।

জেনারেলদের খেলতে খেলতেই তো কেটে যায় কয়েক বছর। দেশে যেহেতু পদলেহি থুতুপায়ী দালালের অভাব নেই, তাই খেলাও জমে বেশ; বছর বছর ধ'রে তারা দালালদের ফুটবল বানিয়ে খেলে, জনগণ খেলা উপভোগ করতে থাকে অন্ধ দর্শকের মতো।

অনেকে আমাদের সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের পতিতাদের সাথে তুলনা করেন। আমি এটাকে খুবই আপত্তিকর ও পতিতাদের জন্যে অপমানজনক ব'লে মনে করি। পতিতারা কোনো সুবিধা নেয়ার জন্যে দেহদান করে না, বেঁচে থাকার জন্যে দেহদান করে; আর আমাদের রাজনীতিবিদেরা সর্বস্ব

দান করে সুবিধার জন্যে। তারা চরিত্রহীন, পতিতারা চরিত্রহীন নয়।

জিয়া অবশ্য 'রাজনীতিবিদ' ধারণাটিকেই বদলে দেন। তিনি দালাল সংগ্রহ করেন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে, পেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় না, একটি শুয়োর পাওয়ার থেকে দালাল পাওয়া অনক সহজ– শুধু রাজনীতিক দল থেকে নয়–, এবং সারাটি জাতিকেই চরিত্রহীন ক'রে তোলেন। ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, হিশাবরক্ষক, আমলা, কামলা, ঠিকাদার, অধ্যাপক, কবি, ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক, মুদি, চর্মকার, কর্মকার– ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র– কোনো জাতের চরিত্র তিনি ঠিক রাখতে দেন নি। এদের মধ্যে যাঁর চরিত্র সবচেয়ে কলঙ্কিত হয়, তিনি আবুল ফজল, এক সময় যিনি 'জাতির বিবেক' ব'লে গণ্য হতেন, জিয়া দেখিয়ে দেন বিবেক কী শোচনীয় জিনিশ বাঙলায়। আবুল ফজল এক সময় ছিলেন শ্রদ্ধেয়, জিয়া তাঁর সতীত্ব এমনভাবে হরণ করেন যে এখন তাঁর নামও কেউ নেয় না।

জিয়ার প্রিয় ছিলো রাজাকাররা। এক নম্বর মুক্তিযোদ্ধা গভীর প্রেমে পড়েছিলেন রাজাকারদের, মুগ্ধ ছিলেন তাদের সৌন্দর্যে ও চরিত্রে। জিয়ার এমন অসামান্য প্রতিভা ছিলো যে তিনি রাজাকারদের মুক্তিযোদ্ধা ক'রে তোলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের রাজাকার ক'রে তোলেন; তিনি চীনপন্থি সাম্যবাদীদের জামাতি আর জামাতিদের চীনপন্থি ক'রে তোলেন। তিনি অভিনব রাজনীতির সূচনা করেন বাঙলাদেশে। তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় দুটি উক্তির একটি হচ্ছে– 'আই শ্যাল মেইক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট', অপরটি 'মানি ইজ নো প্রব্লেম'।

দুটি উক্তিকেই তিনি সত্যে পরিণত করেছিলেন।

১৯৭৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারিতে তিনি 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' (জাগদল) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। তিনি এটি তৈরি করেন, কিন্তু এর সদস্য হন না; সেটা তাঁর ইচ্ছে, কারো কিছু বলার ছিলো না।

১৯৭৮-এর ২১ এপ্রিলে হঠাৎ ঘোষণা করেন যে ১৯৭৮-এর ৩ জুনে অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এটাও তাঁর ইচ্ছে।

তিনি নিজের পায়ের নিচে জড়ো করেন কয়েকটি দল– চীনপন্থি, পাকিস্তানপন্থি, ইসলামপন্থি, রাজাকারপন্থি সবাই তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করে। তিনি তাদের প্রার্থী হন প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে। যতো মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিব বিরোধী ছিলো দেশে, সবাই জড়ো হয় তাঁকে ঘিরে।

আর কারো দাঁড়ানোর দরকার ছিলো না, সবাই জানতো রেকর্ড ভোটে জিতবেন জেনারেল জিয়া, তার ছক ওপরে ও জনগণের মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিলো; তবু কয়েকটি অপ্রকৃতিস্থ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় বা দাঁড়িয়ে তাঁকে সহযোগিতা করে, একনায়কের অভিলাষকে একটি রাজনীতিক রূপ দেয়। তাদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল ওসমানিও।

জেনারেল জিয়া ৭৩% ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট হন।

কম ভোটই তিনি পেয়েছিলেন, তিনি পেতে পারতেন ৯৮% ভোট। এটা ছিলো তাঁর বিজয়, সব জেনারেলই এরকম বিজয়ের স্বাদ পেয়েছে।

১৯৭৮-এর ১ সেপ্টেম্বরে তিনি গঠন করেন নিজের দল *বাঙলাদেশ ন্যাশন্যালিস্ট পার্টি*, সংক্ষেপে 'বিএনপি'। ইংরেজি সংক্ষিপ্ত নামেই এটি বেশি পরিচিত। এর বাঙলা নামও আছে, তবে বাঙলা ভাষায় নামটি বেশি ভারি হয়ে ওঠে ব'লে 'বিএনপি' নামেই এটি জনপ্রিয়। এটিকে ঠিক রাজনীতিক দল বলা যায় না; বিশেষ রাজনীতিক আদর্শ সামনে রেখে রাজনীতিকদের দ্বারা গঠিত ও বিকশিত দল নয় এটি। এটি হঠাৎ-তৈরি জেনারেলের দল, রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর মতো এটি জন্মলগ্নেই 'যৌবনে গঠিতা/পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'; এটি গঠিত বিপুল বিষম উপাদানে, উপাদানগুলোর সকলেরই লক্ষ্য নানা ধরনের সাফল্য, এর বৈশিষ্ট্য প্রতিক্রিয়াশীলতা।

১৯৭৯র ১৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। এটা ছিলো দেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন; অনেকটা ১৯৭৩-এরটির মতোই কলঙ্কিত, কিন্তু কারো কিছু বলার ছিলো না। এটা ছিলো হিশেব করা নির্বাচন; কোন দল কটি আসন পাবে, কাকে পাশ করানো হবে আর হবে না, সবই আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো। ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি পায় ২২০টি; এবং বাঙলাদেশ এগিয়ে যায় বাঙলাদেশি জাতীয়তাবাদের অভিমুখে।

জিয়া দেশটিকে ক্রমশ বাঙলাস্তান ক'রে তোলেন। দেশজুড়ে পাকিস্তানি ও ইসলামি সাইমুম বইতে শুরু করে।

বাঙলাদেশকে বাঙলাস্তান করার জন্যে জিয়া যে-সব ব্যবস্থা নেন, সেগুলোর কয়েকটি হচ্ছে (১৯৭৯র ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে) :

সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে) সংযোজন করেন।

'বাঙালি' জাতিকে 'বাঙলাদেশি' ব'লে শনাক্ত করেন।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাদ দেন; সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের 'সকল কাজের ভিত্তি' ব'লে ঘোষণা করেন।

'সমাজতন্ত্র'-এর নতুন সংজ্ঞা দেন তিনি, এটা হয় 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার'।

কিন্তু তিনি বাকশালের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ঠিকই রেখে দেন; এবং প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীদের তাঁর ব্যাটম্যানে পরিণত করেন।

বাঙলাদেশ একটি ক্ষুদ্র আইউব খাঁ লাভ করে।

জিয়া মূলত বাঙলাদেশকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করেন, যাকে

পূর্ণ রূপায়িত করে তাঁর উত্তরপুরুষ এরশাদ।

'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম' ও 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের সকল কাজের ভিত্তি' ব্যাপারগুলো প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা; সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে বিভ্রান্ত করার চতুর কৌশল। এদেশের মুসলমানেরা আগেও ধর্ম পালন করেছে, এখনো করছে; তাদের কেউ বাধা দেয় নি। কিন্তু ধর্মকে রাজনীতিক হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার হচ্ছে ধাপ্পা, জনগণকে কিছু না দেয়ার কৌশল। জনগণকে তারা ভেস্ত দেবে, কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা দেবে না। জিয়ার সময় থেকে সরকারি অনুষ্ঠানগুলোতে,–আমলাদের কাজ মানেই তো অনুষ্ঠান, তেলায়াতের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, মৌলভিরা সুযোগ বুঝে তেলায়াত, তর্জমা, ব্যাখ্যায় মেতে ওঠে; কাজ মুখ থুবড়ে পড়ে। এখন এটা এতোদূর বেড়েছে যে সরকারি অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে তেলায়াত ও তর্জমার মহফিল, মন্ত্রী-আমলারা তেলায়াতেই বিবশ হয়ে পড়ে, পরে আর কিছু করতে পারে না।

ধর্মের যদি কোনো উপকারিতা থাকতো, তাহলে বাঙলাদেশ এখন পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও উন্নত দেশে পরিণত হতো; কিন্তু এটি পরিণত হয়েছে নষ্টতম দেশে। ধার্মিকদের দুর্নীতিতে দেশ এখন জর্জরিত।

ধর্মের কোনো উপকারিতা নেই, অপকারিতা বিপুল।

জিয়ার সময় থেকে পিরদের প্রতাপ বাড়তে থাকে, কালোবাজারিরা মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু করে। বাঙলাদেশে নাস্তিক আছে ক-জন? সবাই তো ধার্মিক। দেশে এতো খুন, করছে কারা? তারা কি নাস্তিক? না, তারা ধার্মিক, তাদের সব কাজে আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা'। দেশে এতো ধর্ষণ, করছে কারা? তারা কি নাস্তিক? না, তারা সবাই ধার্মিক, তারা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, তাদের সব কাজে আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা'। দেশে এতো ঘুষ খাওয়াখাওয়ি, এতো ঋণখেলাপি। তারা কি নাস্তিক? না, তারা ধার্মিক, পাজেরো হাঁকিয়ে তারা মসজিদে যায়, তাদের সব কাজে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা' আছে।

আমলারা কি নাস্তিক? না, তাদের সব কাজে আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা'। দারোগাপুলিশরা কি নাস্তিক? না, তাদের সব কাজে আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা'। কাস্টমসের লোকেরা, ব্যাংকের লোকেরা কি নাস্তিক? না, তাদের সব কাজে আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা'।

ডিসিরা, এসপিরা, জজরা কি নাস্তিক? না, তাদের সব কাজে আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা'। হজ আর ওমরা কারা করে? তারা কি নাস্তিক? তারা আস্তিক, তাদের সব কাজে আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর

ওপর পূর্ণ আস্থা'।

এমনকি পতিতারাও এখানে নাস্তিক নয়, তাদেরও আছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা'।

তবু বাঙলাদেশ কেনো এতো দুর্নীতিগ্রস্ত? বিশ্বে প্রথম?

একটি নাস্তিকও দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, কিন্তু প্রতিটি ধার্মিকই দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের দুর্নীতির মূলস্তম্ভ টাকা; ঘুষ ছাড়া, অবৈধ উপায়ে টাকা বানানো ছাড়া, বাঙলাদেশে আর কোনো পবিত্র কাজ নেই।

জিয়া সূচনা ক'রে গেছেন এ-ধারণা যে ধর্ম ও দুর্নীতির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; আর এরশাদ তাঁর গুরুর তত্ত্বকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করে। এরশাদ দুর্নীতিকেই ধর্মে পরিণত করে। জিয়া ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না; তাঁর উর্দির নিচের গেঞ্জিটাও না কি ছেঁড়া ছিলো। তবে তাঁর সাফারি পোশাকটি ছিলো ঝকঝকে। কিন্তু তাঁর অনুচররা দুর্নীতিতে নানা সাফল্য অর্জন করে।

জিয়া সৎ ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবার এখন বাঙলাদেশের প্রধান ধনীপরিবারগুলোর একটি; এবং সবচেয়ে শক্তিমান পরিবার।

এখন আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হ'লেও জাতীয় ধর্ম দুর্নীতি।

বাঙলাদেশ গণতন্ত্রের নামে এগোচ্ছে জিয়া-এরশাদের পথ ধ'রেই।

জিয়ার সময় থেকেই শুরু হয় ধর্মান্ধতা, যুক্তিবিরোধিতা, বাকস্বাধীনতা-হীনতা; রাজাকার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্যে তিনি স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। তিনি প্রায় সবাইকে নষ্ট ও দুশ্চরিত্র ক'রে তোলেন, যদিও নিজে সৎ থাকার ভাবমূর্তি তৈরি করেন।

জেনারেলরা যেভাবে গরিব জনগণকে মুগ্ধ করে, তিনি সেভাবেই তাদের মুগ্ধ করতেন। সাফারি জামা প'রে আমলা ও অনুচরদের নিয়ে পথে পথে ছুটতেন, জিন্স আর গেঞ্জি প'রে খাল কাটতেন, হেলিকপ্টারে ঘুরে জনগণের অবস্থা দেখতেন, এবং হঠাৎ কোথাও হেলিকপ্টার থেকে নেমে জনগণকে আনন্দে উল্লাসে সুখী ক'রে তুলতেন।

তাঁর সানগ্লাসের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো জনগণ।

জনগণ এমন সানগ্লাস আগে দেখে নি।

আমলারা ও অনুচরেরা সানগ্লাস পরার সাহস করে নি; কেননা ওটি ছিলো একক ও পবিত্র; কিন্তু জিয়ার সাফারি পোশাকের ফ্যাশনে দেশ ভ'রে গিয়েছিলো। প্রতিটি আমলা ও অনুচরের ছিলো একগুচ্ছ সাফারি জামা; ওগুলো প'রে তারা ধন্য বোধ করতো। এখন অনেক আমলা আবার তাদের পুরোনো সাফারি ইস্ত্রি ক'রে পরতে শুরু করেছে।

জিয়া বীর হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে ঘিরে সব কিছু আবর্তিত হতো।

তিনি ছিলেন রাজাকারদের ত্রাণকর্তা, রাজাকাররা কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে, যদিও রাজাকাররা কৃতজ্ঞতায় বিশ্বাস করে না। জিয়া ঘেরাও ছিলেন দেশের সমস্ত দুষ্টদের দ্বারা, যেমন মুজিবও ছিলেন; কিন্তু মুজিবের পাশে জিয়া ক্ষুদ্র। মুজিব নিজের অজান্তে আক্রান্ত হয়েছিলেন নষ্টদের দ্বারা, তিনি বুঝতে পারেন নি; জিয়া সুপরিকল্পিতভাবে চারপাশে জড়ো করেছিলেন নষ্টদের। তিনি সূচনা ক'রে গেছেন বাঙলাদেশের অন্ধকার যুগের, এরশাদ যেটিকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করে।

কিন্তু জিয়া, ছোট্ট একনায়ক, গন্তব্যে পৌঁছে যান তাঁরই এক প্রতিদ্বন্দ্বীর আগ্নেয়াস্ত্রের ক্রোধে। এতে জনগণের কোনো ভূমিকা ছিলো না; তারা শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখে সামরিক বীরদের শৌর্যবীর্য।

জিয়া খুন হয়েছিলেন ঢাকা থেকে দূরে, চট্টগ্রামে, যেখানে ঘটেছিলো [illegible] এরশাদ সামরিক স্বৈরাচারে যোগ ক'রে [illegible] স্বৈরাচারকে বহুমাত্রিক ক'রে তোলে।

খলতা, ভণ্ডামো, ভাঁড়ামো, নারীলিপ্সা, চরিত্রহীনতা, অভিনয়, দুর্নীতিতে এরশাদ তুলনাহীন, সে গোপাল ভাঁড় ও ক্যাসানোভা ও জল্লাদের এক তিক্ত মিশ্রণ। এমন কোনো অপরাধ নেই যা সে করে নি, এমন কোনো পদ্ম নেই যাকে সে দূষিত করে নি, এবং সে আমাদের প্রচুর মজাও দিয়েছে। ধর্ম থেকে কবিতা পর্যন্ত সব কিছু সে নষ্ট করে।

হয়তো সে ছিলো মনোবিকলনগ্রস্তও, অস্বভাবী– সন্তান জন্ম দিতে না পারার ব্যর্থতা তাঁকে পাগলে পরিণত করেছিলো।

চেঙ্গিস খাঁও ছিলো নপুংসক, এটা তাকে হিংস্র ক'রে তুলেছিলো।

এরশাদের সম্ভবত একটিই গুণ– আমাদের শাসকদের মধ্যে সে-ই বাঙলা ভাষাটি বলতে পারতো সবচেয়ে ভালো। বিনয়েও সে ছিলো দক্ষ; জেনারেল জিয়ার এক দাস সৈয়দ আলী আহসান জিয়ার মৃত্যুর পর জিয়াকে বলেছিলেন 'বেয়াদপ', একজন প্রগতিশীল লেখক-অধ্যাপক উপাচার্য হওয়ার জন্যে গিয়েছিলেন এরশাদের কাছে, তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'এরশাদ অত্যন্ত ভদ্র'।

এক ডগমগে নারী আমাকে বলেছিলেন, 'কাছে থেকে দেখতে এরশাদ অত্যন্ত সুদর্শন', যদিও ছবি ও টিভিতে তাকে দেখাতো বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রের একজন ভাঁড়ের মতো, ভাঁড়টির নাম আমি ভুলে গেছি।

আমি এরশাদকে দেখি নি, দেখেছি তার হিংস্রতা ও ভণ্ডামো।

জিয়ার লাশ ঢাকায় পৌঁছোনোর পর সে শবাধারের ওপর প'ড়ে যেভাবে কাঁদছিলো, বিলাপ ক'রে বলছিলো, 'আগে জানলে স্যারকে আমি চট্টগ্রামে যেতে দিতাম না', ওই দৃশ্য জহর রায়ের অভিনয়কেও হার মানিয়েছিলো। চক্রান্ত ও ভাঁড়ামোর এক চমৎকার সমন্বয় এরশাদ। তখন

বদলে সরাসরি সামরিক শাসন; ২৪ মার্চ ১৯৮২ থেকে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত– সাড়ে চার বছর– বাঙলাদেশ আবার উপভোগ করে সামরিক শাসন। আমরা বুটের আওয়াজকে ঐকতান মনে করতে থাকি।

কিন্তু আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

এরই জন্যে বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

আমরা কি চেয়েছিলাম মুজিব হয়ে উঠবেন মহাএকনায়ক?

আমরা কি চেয়েছিলাম ছোটো একনায়ক জিয়াকে?

আমরা কি চেয়েছিলাম ভণ্ড একনায়ক এরশাদকে?

আমরা কি চেয়েছিলাম একের পর অসামরিক ও সামরিক একনায়ক ও একনায়ক ও একনায়ক ও একনায়ক?

এরশাদ সামরিক স্বৈরাচারে যোগ করে অজস্র নতুন মাত্রা; সে সামরিক স্বৈরাচারকে বহুমাত্রিক ক'রে তোলে।

খলতা, ভণ্ডামো, ভাঁড়ামো, নারীলিপ্সা, চরিত্রহীনতা, অভিনয়, দুর্নীতিতে এরশাদ তুলনাহীন, সে গোপাল ভাঁড় ও ক্যাসানোভা ও জল্লাদের এক তিক্ত মিশ্রণ। এমন কোনো অপরাধ নেই যা সে করে নি, এমন কোনো পদ্ম নেই যাকে সে দূষিত করে নি, এবং সে আমাদের প্রচুর মজাও দিয়েছে। ধর্ম থেকে কবিতা পর্যন্ত সব কিছু সে নষ্ট করে।

হয়তো সে ছিলো মনোবিকলনগ্রস্তও, অস্বভাবী– সন্তান জন্ম দিতে না পারার ব্যর্থতা তাঁকে পাগলে পরিণত করেছিলো।

চেঙ্গিস খাঁও ছিলো নপুংসক, এটা তাকে হিংস্র ক'রে তুলেছিলো।

এরশাদের সম্ভবত একটিই গুণ– আমাদের শাসকদের মধ্যে সে-ই বাঙলা ভাষাটি বলতে পারতো সবচেয়ে ভালো। বিনয়েও সে ছিলো দক্ষ; জেনারেল জিয়ার এক দাস সৈয়দ আলী আহসান জিয়ার মৃত্যুর পর জিয়াকে বলেছিলেন 'বেয়াদপ', একজন প্রগতিশীল লেখক-অধ্যাপক উপাচার্য হওয়ার জন্যে গিয়েছিলেন এরশাদের কাছে, তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'এরশাদ অত্যন্ত ভদ্র'।

এক ডগমগে নারী আমাকে বলেছিলেন, 'কাছে থেকে দেখতে এরশাদ অত্যন্ত সুদর্শন', যদিও ছবি ও টিভিতে তাকে দেখাতো বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রের একজন ভাঁড়ের মতো, ভাঁড়টির নাম আমি ভুলে গেছি।

আমি এরশাদকে দেখি নি, দেখেছি তার হিংস্রতা ও ভণ্ডামো।

জিয়ার লাশ ঢাকায় পৌছোনোর পর সে শবাধারের ওপর প'ড়ে যেভাবে কাঁদছিলো, বিলাপ ক'রে বলছিলো, 'আগে জানলে স্যারকে আমি চট্টগ্রামে যেতে দিতাম না', ওই দৃশ্য জহর রায়ের অভিনয়কেও হার মানিয়েছিলো। চক্রান্ত ও ভাঁড়ামোর এক চমৎকার সমন্বয় এরশাদ। তখন

বি চৌধুরীকে দেখাচ্ছিলো অসহায়, যা কখনো কাটে নি।

১৯৮২র ২৪ মার্চ থেকে ১৯৯০-এর ৬ ডিসেম্বর, বাঙলাদেশের ও আমাদের জীবনের সাড়ে আটটি বছর, নষ্ট দূষিত কলুষিত ক'রে গেছে এরশাদ। সে ছিলো ভাঁড়, খলনায়ক; তাঁর জীবনে কোনো ট্র্যাজিক মহিমা নেই, ভাঁড়ের মতোই সে এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু সে বাঙলাদেশকে নষ্ট করেছে, ভ্রষ্ট করেছে, পিছিয়ে দিয়েছে; জিয়া যে-অতীতমুখিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা শুরু করেছিলেন, তাকে সে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

এরশাদ অবশ্য জানতো বঙ্গে সে একাই নষ্ট নয়।

তার মতো, এবং তার থেকে নষ্টতর, বাঙলাদেশির কোনো অভাব ঘটবে না সোনার বাঙলায়। এটা সে দেখে এসেছে বড়ো আইউবের কালে– পাকিস্তানে, ছোটো আইউবের কালে– বাঙলাদেশে। কতো নষ্টভ্রষ্ট, পুরুষ ও নারী, দালাল ও কবি যে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো, তার হিশেব কে রাখে? কী যে শোচনীয়তা দেখেছি আমরা তার সময়ে। সে দুটি নতুন জিনিশ যোগ করেছিলো তার সময়ে– লাম্পট্য ও কবিতার দূষণ।

সব কিছুকে সে দূষিত করেছে, কবিতা ও নারীকেও বাদ দেয় নি।

দূষণ হচ্ছে তার প্রকৃত নাম।

এখনও সে দূষণ থেকে উঠে আসে নি; সে ইসলামের কাণ্ডারি, ভেস্তে গিয়েও সে ওই এলাকাটিকে দূষিত করবে!

ইসলামকেও সে দূষিত ক'রে গেছে। সে না কি স্বপ্ন দেখতো বিশেষ একটি মসজিদে তাকে নামাজ পড়তে হবে। দলেবলে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হতো, যদিও তার স্বপ্ন ছিলো সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত।

এক পিরকে সে প্রায় পয়গম্বরে পরিণত করেছিলো।

ভণ্ডামোতে তার দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যাবে না কোথাও।

জিয়ার মতো সেনাঅরাজকতার মধ্য দিয়ে তাকে ক্ষমতা দখল করতে হয় নি; মঞ্জুর তার জন্যে পথ তৈরি ক'রে গিয়েছিলো জিয়াকে হত্যা ক'রে। তাকে শুধু বছরখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। কিন্তু সে চুপচাপ অপেক্ষা করে নি।

প্রবন্ধ লিখে এবং সেনাভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ক'রে (২৯ নভেম্বর ১৯৮১) সে দাবি করে যে দেশশাসনে সেনাবাহিনীর ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব থাকা উচিত। তখনই বোঝা যায় সে শক্তিমান হয়ে উঠেছে, এটা শুধু তার একার কথা নয়, পুরো সেনাবাহিনীরই কথা। অথর্ব সাত্তার তাকে সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে বরখাস্তও করেছিলো, কিন্তু তা কার্যকর করার ক্ষমতা তার ছিলো না।

২৩ মার্চ ১৯৮২তে সাত্তার এরশাদকে বরখাস্ত করার উদ্যোগ নেয়,

আর ২৪ মার্চে এরশাদই তাকেই রাষ্ট্রপতির পদ থেকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতি হয়, এবং দেশ আবার সামরিক আইনের ছায়াতলে আসে। এরশাদ অবশ্য রক্তপাত ঘটিয়ে আসে নি, কারণ সে যাকে হটিয়ে আসে, সেই সাত্তারের কোনো রক্ত ছিলো না। বিচারপতিরা কী জিনিশ, তা আগেই দেখিয়েছিলেন জিয়া, সায়েমকে দিয়ে; এবার দেখায় এরশাদ।

বুড়ো সাত্তারের জন্যে দেশের কারো কোনো মায়া ছিলো না।

লোকজন তার অথর্বতাকে, তার বিড়বিড় উচ্চারণকে, ঘৃণাই করতো। সে কখনো নায়ক ছিলো না, ছিলো অথর্ব, দাস ও কিছুটা খলনায়ক। এরশাদ তাকে নায়ক হওয়ার একটা সুযোগ এনে দিয়েছিলো। ওই বুড়ো বয়সে সে যদি প্রতিবাদ ক'রে প্রাণ দিতো, তাহলে সে মৃত্যুতেও কিছুটা মহিমা পেতো। কিন্তু ক্ষুদ্রের ভাগ্যে মহত্ত্ব নেই, হায়েনা কখনো সিংহ হ'তে পারে না; সাত্তার প্রতিবাদ তো করেই না, বরং সে এরশাদ ও তার সামরিক শাসনকে শুভেচ্ছা জানায়– বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিয়ে।

এরশাদ সর্বময় ক্ষমতা অধিকার করে।

বাঙলাদেশে আবার রচিত ও পঠিত হয় সামরিক দেবদূতদের একই ব্যাকরণ; বাঙলাদেশ আবার জলপাইরঙের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

এই দেবদূতও ঘোষণা করে সামরিক একনায়কদের, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের, ব্যাকরণের একই সন্ধি-কারক-সমাস : সেও জানায় সে রাজনীতিক নয়, সে একজন মহান সৈনিক, দেশোদ্ধার ক'রে, দেশকে স্বর্গে পরিণত ক'রে, সে আবার ফিরে যাবে তার মহান সৈন্যাবাসে।

অর্থাৎ সেও জনগণকে পড়ায় সেই একই সরল সামরিক শাসনের ব্যাকরণ, যার প্রতিটি অধ্যায়ই তার গুরুর ব্যাকরণের প্রতিলিপি।

সেই একই প্রহসনের হ্যাঁ/না গণভোট, সে পায় ৯৪.১৪% ভোট; অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫র ২১ মার্চে।

সেই একই প্রহসনের নির্বাচন, ১৯৮৬র ১৫ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সে পায় ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩৩৭ ভোট, আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, একটি হুজুর, পায় ১৫ লক্ষ ১০ হাজার ৪৫৬ ভোট।

সে আর ফিরে যায় নি; সে চতুর, দেশ শাসন করেছে সে সবচেয়ে বেশি সময় ধ'রে, দুর্নীতিও করেছে সবচেয়ে বেশি; কিন্তু ভাঁড় হিশেবে দক্ষতা দেখিয়ে সে টিকে গেছে। টিকে থাকা কাউকে মহৎ করে না, সে টিকে আছে তেলাপোকার মতো। ভণ্ডামোতে সে অদ্বিতীয়; আজো মাঝেমাঝে ইসলাম নিয়ে মাতে, একটু একটু বিদ্রোহ করে সুযোগ বুঝে, খালেদা জিয়ার ভয়ে আবার গর্তে ঢোকে, এবং চালিয়ে যাচ্ছে আজো তার প্রিয় শিল্পকলা, লাম্পট্য– জন্ম দিয়ে চলছে বিস্ময়কর সন্তান।

ক্ষুদ্রদের অধীনে বাস ক'রে ক'রে আমরা সবাই ক্ষুদ্র হয়ে গেছি।

আমরা যে মহৎ কিছু করত পারি না তার কারণ এতো ক্ষুদ্রদের অধীনে জীবন ধারণ ক'রে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে আমাদের ভেতরে কোনো মহৎ স্বপ্ন জেগে উঠতে পারে না।

আমার দুর্ভাগ্য এরশাদের মতো ক্ষুদ্রকে নিয়েও আমাকে লিখতে হচ্ছে। আমি বরং সুখ পেতাম একটি চাষীকে নিয়ে লিখে, একটি কাককে নিয়ে লিখে, একটি বেড়ালকে নিয়ে লিখে। আমি বরং সুখী হতাম সবুজ প্রান্তর বা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

দেশ দখল করার পর তার ঘোষণার মধ্যে কোনো অভিনবত্ব ছিলো না; তবে সে তার কাজে আল্লাকেও ব্যবহার ক'রে নেয়। সে জানায় 'আল্লাহর সাহায্যে' সে 'সরকারের সকল ও পূর্ণ ক্ষমতা' গ্রহণ করেছে।

জিয়া 'বিসমিল্লাহ' ব্যবহার করেছিলেন, সে সরাসরি ব্যবহার করে আল্লাহকে। আল্লাহকে ব্যবহারের ইতিহাস অবশ্য দীর্ঘ, ১৪০০ বছরে অজস্র একনায়ক আল্লাহকে ব্যবহার করেছে। ইহলোকে আল্লাহ তার ক্ষমতা খাটায় না পরলোকে মারাত্মক শাস্তি দেবে ব'লে; নইলে এগুলোকে ইহলোকেই পারমাণবিক আগুনে পোড়াতো।

বোঝা যায় তার বিরুদ্ধে কোনো খালেদ বা মঞ্জুর নেই; সে সব কিছু ঠিক ক'রে ফেলেছে। সশস্ত্রবাহিনী আবার ক্ষমতা চায়।

জিয়া যেমন এসেই পেয়েছিলেন বিচারপতি সায়েমকে, যাকে তিনি খাটিয়েছিলেন চাকরের মতো, এরশাদ তেমন কাউকে পায় নি; বরং একটি বিচারপতিকে উৎখাত ক'রেই সে আসে। সে কারো ছদ্মঅধীনেও থাকতে চায় নি। সে আসে সরাসরি প্রভু হয়ে, কারো অধীনে নয়; সে তার অসামান্য ক্ষমতা অকপটে রাষ্ট্র করতে কোনো দ্বিধা করে নি।

তার ঘোষণা ইহুদিদের প্রভু জিহোভার ঘোষণার মতোই।

সে জানায় সে যে-কোনো ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্টের চাকুরি দিতে পারে।

ইচ্ছে মতো তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করতে পারে।

প্রেসিডেন্টকে সে যে-কাজ দেবে, প্রেসিডেন্টকে সে-কাজ করতে হবে; অর্থাৎ ওই নামে সে একটি চাকর নিয়োগ করবে।

তার কোনো কপটতা ছিলো না এ-ব্যাপারে, বঙ্গীয় ভাষায় যাকে 'বাপের ব্যাটা' বলে, এরশাদ ছিলো তাই।

অন্তত তার ঘোষণায়, যদিও সে রক্তপাত করেছে কমই। জিয়া রক্তপাত করেছে সৈন্যাবাসে, আর এরশাদ করছে বাইরে– ছাত্রদের ও আন্দোলনকারীদের রক্তে সে রাজপথ ভিজিয়েছে, কিন্তু সৈনিকদের রক্তে সৈন্যাবাস ভিজোয় নি ' বোঝা যায় তার এলাকা ছিলো তার পক্ষে।

প্রেসিডেন্টের নামে সে একটি পরিচারক– চাকর– চেয়েছিলো;

পরিচারক পেতে তার কোনো কষ্ট হয় নি। অজস্র পরিচারক পুরোনো স্যুটকোট ইস্ত্রি ক'রে প'রে প্রস্তুত ছিলো। এই প্রতিযোগীদের মধ্যে দৌড়ে সব সময় এগিয়ে থাকে আমাদের মহামান্য বিজ্ঞ বিচারপতিরা, যাদের ওপর আমরা অর্পণ করেছি ন্যায়ের ভার।

আমরা আমাদের বিচারপতিশ্রেণীকে অনেকটা ফেরেশতা মনে করি।

তাদের পবিত্র মনে করি, নিষ্পাপ মনে করি।

তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার শেষ নেই; এবং আমরা তাদের যথেষ্ট পরিমাণে বেতন ও ভাতা দিয়ে সুখে রাখার সাধনা করি।

কিন্তু সেনাপতিরা এসেই একটি বিচারপতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে, সে পরম সুখে দাসের কাজ সম্পন্ন করে। আবার যখন বিপুল রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আমরা সেনাপতিদের হটাই তখনো একটি বিচারপতিকে, প্রধান বিচারপতিকে, বেছে নিই আমাদের মহান তত্ত্বাবধায়করূপে।

বিচারপতিদের সম্পর্কে আমি কমই জানি, তবে শুনেছি নিম্নমানের আইনজীবীরাই এ-পদে নিযুক্ত হয়। তাদের সারাজীবনের কর্মকাণ্ডের বিবরণ নিলে অনেক সময় শিউরে উঠতে হয়। আমি কয়েকজনের বিবরণ নিয়েছি, শিউরে উঠেছি; তবে তার বর্ণনা করবো না।

এরশাদের পরিচারক বা প্রেসিডেন্ট হয় বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী। জানি না সে বেঁচে আছে কি না। তার এক সামরিক সচিব তার সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন *যখন বঙ্গভবনে ছিলাম* নামে, যদি ওই সচিবের দৃষ্টি গভীর হয়, তাহলে ধ'রে নিতে হবে আহসানউদ্দিন চৌধুরী আর নেই, যদি সে এখনো থেকে থাকে, তাহলে খুঁজে দেখতে হবে কচ্ছপদের জীবন কেনো এতো দীর্ঘ হয়।

এরশাদ নষ্ট ভ্রষ্ট দুষ্ট, কিন্তু তাকে কী দোষ দেবো যেখানে আমাদের বিজ্ঞ সম্মানিত মাননীয় বিচারপতিরাই নষ্টভ্রষ্টের দাস হওয়ার জন্যে এতো পাগল। যাদের কাজ মানুষের অধিকার রক্ষা করা, সংবিধান রক্ষা করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, তারাই যখন সেনাপতিদের ব্যাটম্যান হওয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, তখন নষ্ট রাজনীতিবিদ ও দুষ্ট সেনাপতিদের কী দোষ দেবো? তখন দোষ দিতে ইচ্ছে করে নিজের জাতিকে।

ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দীন আহমেদ *যখন বঙ্গভবনে ছিলাম* নামে একটি মজার বই লিখেছেন, এটি প'ড়ে যে-মজা পেয়েছি, গোপাল ভাঁড়ের গল্প প'ড়েও ততো মজা পাই নি। তিনি তখন বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব, আর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী।

রাষ্ট্রপতি মানে এরশাদের ভৃত্য, ভৃত্য মানে চাকর।

শামসুদ্দীন চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন আহসানউদ্দিনের।

সে বিপুল দেহের অধিকারী। সে বাচাল, শুধু কথা বলে; এটা বিচারকদের একটি বদভ্যাস– তারা শোনার থেকে বাজে কথা বলতে পছন্দ করে, কেননা তারা যা বলে সেটাই শেষ কথা। আর ভালোবাসে খেতে। খাওয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। লোকটি সাফল্যের প্রতিমূর্তি, ১৯৪২-এ চাকুরি শুরু করেছিলো তুচ্ছ মুন্সেফ হিশেবে, আর ১৯৮২তে হয় রাষ্ট্রপতি, যদিও মূলত একটি সেনাপতির পরিচারক।

পাকিস্তান থাকলে কি সে পরিচারকও হ'তে পারতো!

বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়ে কতো তুচ্ছকে উচ্চ করেছে, তবু এরা দেশকে পিষ্ট করে দিনরাত।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা কতো পরিচারককে কতো কিছু করেছে।

যার মাঠে ঘাস কাটার কথা ছিলো সে হয়েছে মন্ত্রী, যার জুতো শেলাই করার কথা ছিলো সে হয়েছে সচিব, যার কর্মকার হওয়ার কথা সে হয়েছে মহাপরিচালক, যার মুদি দোকানদার হওয়ার কথা সে হয়েছে শিল্পপতি। তবু চাকররা পাকিস্তানকে ভুলতে পারে না; পুরোনো ভৃত্যরা কখনোই আদিমনিবের কথা ভুলতে পারে না।

আহসানউদ্দিন ধার্মিক ছিলো, থাকতেই হবে, পচা মাথায় ধর্ম ছাড়া আর কী থাকতে পারে?

কিন্তু ধর্ম পালন করতো সে মহাজাঁকজমকের সঙ্গে। তার নামাজ পড়ার দৃশ্য দেখে হয়তো ফেরেশতারাও চমকে উঠতো। তার নামাজ পড়ার সময় মসজিদ পাহারা দিতো দুই প্লাটুন, ৫০/৬০জন, সশস্ত্র সৈন্য। এটা যার তার নামাজ নয়, রাষ্ট্রপতির নামাজ; তাই সেনাপ্রহরা থাকতে হবে। না কি তার মনে পড়তো ইসলামের ইতিহাসের কথা? ওমরের কথা, ওসমানের কথা? কিন্তু তার তো কোনো ক্ষমতা ছিলো না যে কোনো আততায়ী ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপরে। লোকটি নিজেকে উপভোগ করতে চাইতো, এরশাদ তাকে সে-সুযোগ দিয়েছিলো।

নামাজে তার যতো আগ্রহ ছিলো, তার থেকে বেশি ছিলো ভোজনে। খেয়ে খেয়ে সে মোটা হচ্ছিলো, জনগণের টাকায় পেট ভ'রে খেয়ে নিচ্ছিলো। হয়তো তার আদর্শ ছিলেন শেরে বাঙলা, যিনি থালের পর থাল ভাত খাওয়ার জন্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

লাখ লাখ টাকার খাবার সে খেয়ে খেয়ে আরো ফুলে উঠেছিলো।

সে নিজে খেতো, আত্মীয়দেরও নিয়মিত খাওয়াতো– জনগণের টাকায়। খাওয়ায় তার কোনো পরিমিতি ছিলো না, খাওয়াই ছিলো তার রাষ্ট্রপতিত্ব। খাওয়া, খাওয়া, ও খাওয়াই ছিলো তার কাজ। জনগণের টাকায় সে পেট ভ'রে খেয়ে নিচ্ছিলো।

আরো একটি কাজ ছিলো তার, তা হচ্ছে এরশাদের পদধুলো নেয়া।

শামসুদ্দীন বহু উদাহরণ দিয়েছেন, এখানে একটি উল্লেখ করি।

১৯৮৩ সালের ১৮ জানুয়ারি এরশাদের স্ত্রী হঠাৎ অলৌকিকভাবে একটি পুত্র প্রসব করে। এটা ছিলো এক স্বর্গীয় গর্ভধারণ। আহসানউদ্দিন এতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। এটা ছিলো জাতির জন্যে একটি কৌতুক, কিন্তু আহসানউদ্দিনের কাছে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

এরশাদের এক উপপত্নী সম্প্রতি জানিয়েছে, এরশাদের যদি সন্তান জন্ম দেয়ার শক্তি থাকতো, পুংসকতা থাকতো, তাহলে সারাদেশ 'কচিকাঁচার' আসর হয়ে উঠতো।

ইত্তেফাক-এর *দাদাভাই* বেঁচে থাকলে এর প্রতিবাদ করতেন। সম্প্রতি এরশাদ তার আরেকটি স্ত্রীর গর্ভে, যদিও একটি স্ত্রী থাকতে আরেকটি স্ত্রী নেয়া বৈধ নয় বাঙলাদেশে, আরেকটি পুত্রের জন্মের সুসমাচার প্রকাশ করেছে। জনগণ মজা পাচ্ছে– সত্যিই এটা এরশাদের? তারা সন্দেহ করছে অনেককে। দেশের এক প্লেবয় জানিয়েছে, এ-পুত্র এরশাদের নয়, প্লেবয়টিরও নয়, তবে এটা কার সে তা জানে না।

১৯৮৩তে এরশাদের পুত্রজন্মদান হয়ে উঠেছিলো জাতীয় সংবাদ।

পৃথিবীতে যেনো কেউ আর পুত্র জন্ম দেয় নি।

আহসানউদ্দিন সেনাভবনে গিয়ে এরশাদকে মোবারকবাদ জানানোর জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। সামরিক সচিবকে না পেয়ে আহসানউদ্দিন তার স্ত্রীকে নিয়েই মোবারকবাদ জানানোর জন্যে চ'লে যায় সেনাভবনে। সে এরশাদের পুত্রকে দেখতে পায় নি, শুধু এরশাদকে দেখেই ফিরে আসে। শামসুদ্দীনকেও যেতে হয় পরের দিন, গিয়ে দেখেন সেনাভবন লোকে লোকারণ্য; মন্ত্রী, জজ, ব্যারিস্টার, আমলা, রাজনীতিবিদ, মেজরে কর্নেলে ব্রিগেডিয়ারে জেনারেলে, ব্যবসায়ীতে ভরা।

আহসানউদ্দিন কি খালি হাতে গিয়েছিলো এরশাদের অলৌকিক পুত্রকে দেখতে? না, খালি হাতে কী ক'রে মনিবের কাছে যায় তার পরিচারক? সে উপহার নিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু নিজের পকেট থেকে পয়সা সে ব্যয় করে নি। ওই উপহারের টাকা কে শোধ করবে? করতে হবে জনগণকেই। তাই ওই উপহার·কেনার বিল পরিশোধ করা হয় জনবিভাগের কোষ থেকে।

এখন জানা হয়ে গেছে ওটা এরশাদের পুত্র নয়।

নপুংসকদের পুত্রলাভের জন্যে চরম ব্যগ্রতা ও উত্তেজনা থাকে।

সায়েমেরও কিছু মর্যাদাবোধ ছিলো, আহসানউদ্দিনের একেবারেই ছিলো না। আমরা যে বিচারপতিদের দেবদূত ভাবি, তা একেবারেই ঠিক নয়; তারা অধিকাংশই ক্ষুদ্র মানুষ; অধিকাংশই সুবিধাবাদী; সেনাপতিরা ও রাজনীতিবিদেরা তাদের নিঃশেষে ব্যবহার করেছে।

এরশাদ তার নিযুক্ত পরিচারক/প্রেসিডেন্টকে অনেক দিন রেখেছে, তারপর বিদায় ক'রে দিয়েছে। জিয়া যে-ভদ্রতার সঙ্গে সায়েমকে বিদায় করেছিলেন, এক বিচারপতিকে পাঠিয়ে আরেক বিচারপতিকে স'রে যেতে অনুরোধ করিয়েছিলেন, এরশাদকে তাও করতে হয় নি। ১৯৮৩ সালের ১০ ডিসেম্বরে এরশাদ আহসানউদ্দিনকে চাকুরি থেকে খারিজ ক'রে নিজেই প্রেসিডেন্ট হয়। একটা অনাবশ্যক পরিচারক রাখার আর দরকার ছিলো না। চাকর রাখার যখন দরকার না থাকে তখন চাকর রাখা ঝামেলামাত্র; আর এরশাদ নিকৃষ্ট মানুষ হ'লেও আহসানউদ্দিনের থেকে উৎকৃষ্ট।

সেনাপতিরা, মহান ত্রাতারা, ক্ষমতায় এসে জনগণকে কিছু দিতে চায়; মহান কিছু দিতে চায়, যা জনগণ আগে কখনো পায় নি।

এরশাদ জনগণকে প্রধান যে-মহান উপহারটি দেয়, তা রাষ্ট্রধর্ম।

যেনো জনগণ রাষ্ট্রধর্মের অভাবে বেহেস্তে যেতে পারছিলো না।

যেনো জনগণ রাষ্ট্রধর্মের অভাবে ঘুমোতে পারছিলো না।

যেনো রাষ্ট্রধর্মের অভাবে দেশে বৃষ্টি হচ্ছিলো না।

যেনো রাষ্ট্রধর্মের অভাবে দেশে গাভীরা দুধ দিচ্ছিলো না।

জেনারেল জিয়া এর গুরু; তিনি সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' ঢুকিয়েছিলেন, বেহেস্তের পথে গরিব জনগণকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রের সকল কাজের ভিত্তি' হিশেবে গ্রহণ ক'রেও নিজের ভিত্তি ঠিক রাখতে পারেন নি; আর এরশাদ জনগণকে পুরোপুরি রাষ্ট্রধর্ম প্রদান ক'রে বাঙলাদেশিদের জান্নাতুল ফেরদৌসে পৌঁছে দেয়।

দেশের প্রগতিশীলেরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন, প্রতিক্রিয়াশীলেরা চুপ থেকেছিলো; আর এখন সবাই চুপ। কারো মুখে এ নিয়ে 'টু' শব্দটি নেই; বরং সবাই মেতে উঠেছে ধর্মে ও রাষ্ট্রধর্মে, হজে ও ওমরায়, বিসমিল্লায়, মোনাজাতে, ও ইনশাল্লায়, আর তেলায়াতে। হাসিনা ও খালেদা ঠিক পাঁচবার নামাজ পড়েন কি না কেউ জানে না, তবে তাঁদের মতো হজ আর ওমরা পৃথিবীর কোনো সরকার প্রধান করে নি; সৌদি বাদশারাও করেছে কি না সন্দেহ। এমনকি পাকিস্তানের বর্তমান একনায়ক জেনারেল একবারও ওমরায় বা হজে যায় নি।

বেহেশতে যখন আমরা যাবো, দেখবো সবাই বাঙলাদেশি।

১৯৮৮র ৭ জুন এরশাদের সংসদে, অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিশেবে গৃহীত হয়। বাঙলাদেশ হয়ে ওঠে একটি ইসলামি রাষ্ট্র। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পেছনে কোনো ধার্মিকতা ছিলো না; ছিলো ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা। দেশের জনগণ অধিকাংশই নিরক্ষর, তারা আল্লাখোদা মানে, অনেকে রোজানামাজও করে, কিন্তু তারা ধর্ম নিয়ে খুব

মাতামাতি কখনো করে নি। কিন্তু জেনারেলরা এসে তাদের মাতিয়ে তোলে ধর্মে। জেনারেল জিয়া সংবিধানের শুরুতে যোগ করেছিলেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'; ধর্মে এরশাদ গুরুকেও ছাড়িয়ে যায়, এরশাদ যোগ করে : 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে।' কিন্তু আমরা দেখেছি অশান্তি অনেক বেড়েছে।

এর জন্যে একা এরশাদকে দোষ দিয়ে লাভ কী?

তখন তো দেশের সব রাজনীতিবিদই প'চে গেছে।

দুর্গন্ধে ভ'রে গেছে সোনার বাঙলা।

রাজনীতিবিদ শব্দটি এখন শয়তানের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে।

অবশ্য বাঙলা ভাষায় এখন কোনো ভালো শব্দই আর ভালো অর্থ প্রকাশ করে না; আর খারাপ শব্দগুলো কোনো অর্থই প্রকাশ করে না।

পেশাদার রাজনীতিক থেকে শুরু ক'রে চর্মকার-কর্মকার-দোকানদাররা বারবার বিছানা বদল ক'রে ক'রে অচিকিৎস্য রাজনীতিক উপদংশে আক্রান্ত হয়ে গেছে। তারা তখন অধিকাংশ এরশাদের শয্যায়। তারা যে কতোবার বিছানা বদল করেছে তার হিশেবে কে রাখে? মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর মুজিবের একদল দাসই হয় মোশতাকের দাস; তারপর জেনারেল ও জেনারেলদের সময়ে তাদের সঙ্গে অনেক নতুন দাস দেখা দেয়, কে যে কখন কার দাস হয়ে ওঠে, কার শয্যায় প্রমোদ যাপন করে, তার কোনো হিশেব থাকে না।

শয্যাবদল ও মনিববদল হয়ে ওঠে রাজনীতি।

একটি ঘটনা মনে পড়ছে। তখন এরশাদ রাজাধিরাজ।

ইংরেজি নববর্ষের এক পার্টিতে– *সাপ্তাহিক বিচিত্রার* আয়োজিত– গেছি আমরা। খালেদা জিয়াও ছিলেন সে-পার্টিতে। তাঁর সঙ্গে আমরা কয়েকজন কথা বলতে চাই। কিন্তু বিএনপির এক নেতা, যাকে এরশাদ এসেই হাজতে ঢুকিয়েছিলো, সে আমাদের বাধা দেয়। দেশনেত্রীর সে তখন বড়ো ভৃত্য। তার প্রহরায় আমরা খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারি নি।

কয়েক দিন পরে দেখি সে এরশাদের মন্ত্রী হয়েছে।

এটা আমাকে মুগ্ধ করেছিলো, আজো মুগ্ধ হয়ে আছি।

পরের বছরের পার্টিতেও খালেদা জিয়া ছিলেন, ওই নেতাও ছিলো। কিন্তু এবার আর তারা একসঙ্গে নেই; খালেদা জিয়া কথা বলছিলেন এদিকে দাঁড়িয়ে, ওই নেতা কথা বলছিলো আরেক দিকে দাঁড়িয়ে। তাদের দুজনকে ঘিরেই ছিলো বহু অনুরাগী।

ওই নেতা এখন আবার বিএনপির শক্তিশালী মন্ত্রী।

এই তো আমাদের রাজনীতিবিদদের আদর্শ চরিত্র, যা পদ্মফুলের

থেকেও পবিত্র। এখন যদি কোনো জেনারেল দেখা দেয়, এরা গিয়ে তার শয্যায় পরম সুখে ঘুমোবে, এবং দেশে দেখা দেবে আরো বহু নতুন চর্মকার কর্মকার দোকানদার।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার সময় প্রগতিশীলেরা প্রতিবাদ করেছিলেন; কিন্তু এখন কোনো রাজনীতিক দল এর বিরুদ্ধে কথা বলে না। বরং প্রতিটি দল ধর্মে মেতে উঠেছে। এরশাদ মসজিদে মসজিদে ছুটে মসজিদগুলোকে অপবিত্র করেছিলো, একটি পিরকে প্রায় পয়গম্বরে পরিণত করেছিলো; দেশে ধর্মের প্রবল বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো; সবাই ছুটেছিলো আটরশির দিকে। এমনকি হাসিনাও নিরুপায় হয়ে ধর্মে মেতে ওঠেন, ওমরা করতে থাকেন, মাথায় পট্টি বাঁধতে থাকেন; তাঁর সঙ্গে গিয়ে অনেক তথাকথিত প্রগতিশীলও ওমরা ক'রে আসে।

হাসিনা এবার ক্ষমতায় নেই, তিনি এখন বেহেস্তচ্যুত।

এবার হাসিনাকে বিশ্ব এস্তেমায় যেভাবে কোরান তেলায়াত করতে দেখা গেলো, কাঁদতে দেখা গেলো, তাতে মনে হলো তিনি তাপসী হাসিনায় পরিণত হয়েছেন; রাজনীতি ছেড়ে তিনি যদি এভাবে ধর্মে মন দেন তাহলে অনিবার্যভাবে বেহেস্তে যাবেন, কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু ক্ষমতায় যেতে পারবেন কি না, তা কেউ নিশ্চিত ক'রে বলতে পারে না।

আল্লার মহিমা কবে কে বুঝতে পেরেছে?

আল্লা কোনো সংবিধান মানেন না; গণতন্ত্রে তাঁর কোনো বিশ্বাস নেই; এমনকি নিজের ভক্তকেও কিছু দেয়ার কথা তাঁর মনে থাকে না।

তবে তাঁর ভক্তরা তাঁকে ভাঙিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায়। ক্ষমতাই হলো আসল কথা, আর সব বাজে কথা।

আমরা বুঝি তাঁরা বেহেস্তে নয়, ক্ষমতায় যেতে চান।

যেতে চান ধর্মীয় ধাপ্পার সাহায্যে।

অক্ষয়কুমার দত্ত, বস্তুবাদী, সৎ, নাস্তিক, উনিশশতকের মধ্যভাগেই একটি চমৎকার সমীকরণ রচনা করেছিলেন :

শ্রম = শস্য

শ্রম + প্রার্থনা = শস্য

∴ প্রার্থনা = ০

শুধু প্রার্থনায় শূন্য ছাড়া কিছু মেলে না। প্রার্থনায় কোনো ফল পাওয়া যায় না, কোনো দিনই পাওয়া যায় নি, যদিও মানুষ হাজার হাজার বছর ধ'রে প্রার্থনা ক'রে আসছে।

আর বেশি প্রার্থনাও এক ধরনের অনৈতিকতা– আমাকে এটা দাও,

ওটা দাও, সেটা দাও, এমন চাওয়া খুবই অনৈতিক ব্যাপার। তবে আমরা মেতে আছি এই অনৈতিকতায়ই। আমরা সহস্র ধারায় দুর্নীতি করছি, ঘুষ খাচ্ছি, ধর্ষণ করছি, এবং বেহেস্তের লোভে প্রার্থনায় মত্ত হয়ে আছি।

এরশাদ ছিলো একটি চরম নষ্ট একনায়ক, সে পেয়েছিলো সমানে সমান নষ্ট এক সহধর্মিনীকে, সংগ্রহ করেছিলো অসংখ্য নষ্ট নারী, এবং অজস্র নষ্ট দাস। বাঙলাদেশের পুরুষরা আগে থেকেই দূষিত ছিলো, এরশাদ দূষিত ক'রে গেছে এমনকি নারী ও কবিতাকে।

সে বাঙলাদেশের চরিত্রটিকেই নষ্ট, দূষিত, ক'রে গেছে।

বাঙলাদেশে একটি সৎ মানুষ পাওয়াই দুর্লভ হয়ে উঠেছে।

অত্যাচার ও চরিত্রহীনতায় সে ছিলো অতুলনীয়; শিল্পী কামরুল হাসান তাঁকে ব'লে গেছেন 'বিশ্ববেহায়া'। এ-নামও সম্ভবত তার জন্যে প্রশংসা।

কোনো শব্দই তার স্বৈরাচার, ভণ্ডামো, দুর্নীতি, ও চরিত্রহীনতাকে প্রকাশ করতে পারে না। তাকে কি বলবো 'ছোটোখাটো কালিগুলা', 'ছোটোখাটো চেংগিশ', না কি নিতান্তই 'আপাদমস্তক ইতর'?

সে এক ব্যাপারে বিপরীত ছিলো জিয়ার– জিয়ার হাত রঞ্জিত ছিলো সৈনিকদের রক্তে, তার হাত রঞ্জিত ছিলো জনগণের রক্তে। অজস্র মানুষ নিহত হয়েছে তার হাতে।

সে ছিলো ভাঁড়, মৃত্যুর ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয় নি; কয়েক বছর বাঁদরের মতো খাঁচায় থাকতে হয়েছে। আমাদের সে আজো ভাঁড়ের মজা যুগিয়ে চলছে।

সে জানে খালেদা জিয়া কী মানবী, তাঁর শক্তি কতোটা; একটু মাথা তুললেই আবার তাকে কেন্দ্রীয় জান্নাতুল ফেরদৌসে পাঠানো হবে। সেটি খুব মনোরম স্থান নয়, সেখানে রাত্রি বিদিশার নিশা নয়।

জনগণের বিদ্রোহে মহাশক্তিমান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে স'রে দাঁড়াতে হয় তাকে; ১৯৯০-এর ৬ ডিসেম্বরে।

বাঙলাদেশে মজার ব্যাপার হলো রক্ত দেয় সাধারণেরা, আর সুবিধা ভোগ করে অসাধারণেরা। এ-সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে বিচারপতিরা অনন্য; তাঁদের আমরা মনে করি দেবদূত। তাদের আছে স্বর্গীয় সোনালি ডানা।

এরশাদের পতনের পর এক অজ্ঞাতনাম বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি, দেবদূত হয়ে দেখা দেন। শাহাবুদ্দিন আহমদ।

ছোটোখাটো ক্ষুদ্র একটি মানুষ, এবং সব দিকেই ছোটোখাটো ক্ষুদ্র।

সামরিক শাসকেরা এলেও বিচারপতিরাই প্রথম সুবিধা ভোগ করেন, আবার রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে সামরিক স্বৈরাচারীদের পতন ঘটলেও তাঁরাই প্রথম সুবিধা ভোগ করেন। শাহাবুদ্দিন আহমদ কখনো

জনগণের পক্ষে কোনো কাজ করেন নি, তিনি ছিলেন নামপরিচয়হীন; ১৯৯০-এর ডিসেম্বরেও আমরা তাঁর নাম জানতাম না।

তিনি ছিলেন সিএসপি– এটাও বিস্ময়কর; শুনেছি আইউব খাঁর সময় তাঁকে প্রশাসনে অযোগ্য বিবেচনা ক'রে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগে পাঠিয়ে দেয়া হয়, সেটাই শাপে বর হয়ে দেখা দেয়; ভাগ্য প্রসন্ন থাকায় একদিন তিনি হন বাঙলাদেশের প্রধান বিচারপতি। ক্ষুদ্র লোকদের ওপর ভাগ্যদেবী চিরকালই প্রসন্ন থাকে। এরশাদের পতনের পর 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'-এর নীতি অনুসারে তিনি হন সরকার প্রধান, যাঁর কাজ একটি বিশুদ্ধ পবিত্র স্বর্গীয় নিষ্পাপ নির্বাচন আয়োজন করা।

যা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, তা বাস্তব হয়ে দেখা দেয় তাঁর ক্ষুদ্র জীবনে। বাস্তব কল্পনার থেকেও অদ্ভুত।

রাজনীতিবিদেরা শয়তান– এ-সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, (প্রধান) বিচারপতিরা দেবদূত– এ-সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে!

রাজনীতিবিদেরা পাপিষ্ঠ– এ-সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, (প্রধান) বিচারপতিরা পুণ্যবান– এ-সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে!

তাঁর কাজ হয় একটি বিশুদ্ধ অবাধনির্বাচন আয়োজন ক'রে শয়তানদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া। তারপর শয়তানরা ৫ বছর শয়তানি করবে, ঘুষ খাবে, কোটি কোটি টাকা বানাবে, দেশ ভ'রে গুণ্ডা তৈরি করবে, হজ আর ওমরায় যাবে, শিঙ্গা বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে রাস্তা মাতিয়ে চলবে, সবাই তাদের 'স্যার, স্যার' করবে, তাদের সময় ফুরিয়ে আসবে, তখন আসবেন আবার এক নতুন দেবদূত।

তিনি আবার বিশুদ্ধ নির্বাচন আয়োজন ক'রে ক্ষমতা তুলে দিয়ে যাবেন নির্বাচিত শয়তানদের হাতে।

অদ্ভুত এক নষ্ট রীতি, দুষ্টচক্র, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাঙলাদেশে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে নির্বাচন ক'রে গণতন্ত্র আসতে পারে না।

লেখাপড়া শিখে অর্থাৎ পাঠ্য ও সহকারি পুস্তক মুখস্থ ক'রে অতিশয় বড়ো বড়ো চাকুরি করার পরও যে আমাদের দেশের বড়ো বড়ো লোকেরা অসংস্কৃত অমার্জিত থেকে যায়, তার এক আদর্শ উদাহরণ শাহাবুদ্দিন আহমদ। আমাদের দেশের শোচনীয়তার একটি কারণ হচ্ছে অমার্জিত রুচি। আমাদের শিক্ষিত, পদস্থ, ও ধনাঢ্যরা মার্জিত রুচি আয়ত্ত করে নি, করলে দেশ এতো দূষিত হতো না। শাহাবুদ্দিন আহমদ বাঙলা ও ইংরেজি কোনোটিই শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারতেন না, এমনকি শুদ্ধভাবে বসতেও পারতেন না। তাঁর গোঁফটিও ছিলো হিটলারের গোঁফের মতো হাস্যকর। মানসিকতায়ও ক্ষুদ্র ছিলেন তিনি; রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পরও আবার তিনি ফিরে যান, ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, প্রধান বিচারপতির পদে।

তবে তিনি একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন আয়োজন ক'রে প্রচুর করতালি পেয়েছিলেন। তাঁর বন্দনায় মুখর হয়েছিলো সবাই।

শুধু আমি ছাড়া।

সুষ্ঠু হয়েছিলো নির্বাচন? হয়তো।

সবাই মনে করেছিলো আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসবে, আওয়ামি লিগের নেতারা সবাই তৈরি হয়ে ছিলো ক্ষমতায় যাওয়ার শপথ নেয়ার জন্যে। কিন্তু দেখা যায় আওয়ামি লিগ আসে নি। আমার মনে আছে শাহাবুদ্দিন প্রথম বলেছিলেন কোনো দলই গরিষ্ঠতা পায় নি; কিন্তু সন্ধ্যায় যখন বিএনপির লোকেরা আগুন জ্বালিয়ে মিছিল শুরু করে, তখন বিচারপতি বিএনপির হাতে ক্ষমতা তুলে দেন।

তিনি ফিরে যান তাঁর প্রধান বিচারপতির কাজে।

গরিব মানুষের ছেলে, মনের ভেতরে যাঁর গরিবি, তিনি একটি বড়ো চাকুরি পেয়েছিলেন– প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন, সেটি কী ক'রে তিনি ছেড়ে দেবেন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও?

ক্ষুদ্রকে চিরকাল ক্ষুদ্রই থাকতে হয়।

কোনো বিশাল পদ ক্ষুদ্রকে মহৎ করতে পারে না।

তিনি যখন অবসর নেন, সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, তিনি একটি বই লিখবেন। বই লিখবেন? তিনি বুঝতে পারেন নি যে বই লেখা প্রধান বিচারপতির কাজ, বা রাষ্ট্রপতির কাজ, বা নাতির মলমূত্র পরিষ্কার করার মতো অতো সহজ নয়। ওই বইটি তাঁর আর লেখা হয় নি।

বইটি যে তিনি লেখেন নি, ভালোই করেছেন; তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি কাগজকালি ইত্যাদির অপচয় করেন নি। আমি আমাদের কয়েকজন বিচারপতির লেখা বই প'ড়ে দেখেছি, আর তাঁদের মেধার দৈন্য দেখে কষ্ট পেয়েছি। অষ্টম শ্রেণীর বালকেরাও ওই সব বই লিখতে পারে।

তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর কোনো লোভ নেই।

কিন্তু পাঁচ বছর পর হাসিনা যখন ক্ষমতায় আসেন, শাহাবুদ্দিনকে হাসিনা রাষ্ট্রপতির পদটি দেন, এবং নিজের জন্যে বিপদ ডেকে আনেন। সেনাপতি আর বিচারপতিদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই।

হাসিনা ভেবেছিলেন এক দেবদূতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশবাসীর হৃদয় জয় ক'রে ফেলবেন, জনগণ আবার তাঁকে ক্ষমতায় বসাবে; কিন্তু তাঁর হৃদয়কে ওয়াজেদ মিয়াও এতোটা ধ্বংস করেন নি, যতোটা করেছে এই বিচারপতি রাষ্ট্রপতি। হাসিনার শিক্ষা পাওয়ার দরকার ছিলো, তিনি অনবরত শিক্ষা পেয়ে চলছেন।

খালেদা জিয়া তাঁর রাষ্ট্রপতিদের সব সময় পদতলে রেখেছেন। তিনি

জানেন যাদের তিনি রেখেছেন, তারা কেউ নয়; তিনি আছেন ব'লেই তারা আছে। জিয়াউর রহমান এটা জানতেন, খালেদা জিয়াও এটা জানেন। জিয়াউর রহমান যদিও কখনো তাঁকে রাজনীতিতে আনেন নি, কিন্তু তিনি অসামান্য রাজনীতি আয়ত্ত করেছেন।

তিনি জানেন তিনিই প্রভু, তাই তাঁর আচরণও প্রভুর। রহমান বিশ্বাস বিশ্বাসী পরিচারকের মতো কাজ ক'রে গেছে, ডাক্তার বদরোদ্দোজা চৌধুরী একটু মাথা তুলতে গিয়েই হাই হিলের আঘাতে বঙ্গভবন থেকে ছিটকে পড়েছেন অতলে।

বিএনপি বঙ্গভবনে ডাক্তারি সহ্য করে না।

আওয়ামি লিগ অসহায়, তার সঙ্গে ফাজলামো করা চলে, আওয়ামি লিগের দয়ায় রাষ্ট্রপতি হয়ে আওয়ামি লিগের কান ম'লে দেয়া যায়; কিন্তু বিএনপির সঙ্গে ফাজলামো করা চলে না।

হাই হিলের নিচে মাথা রেখে রাষ্ট্রপতি হ'তে হয়, বিএনপি তা জানিয়ে দিয়েছে। সবাই জেনে গেছে। অনেকেই তা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো, ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলো,– যাই হোক বঙ্গভবনে স্যুটকোট প'রে ব'সে ব'সে ঘুমোনো খুব খারাপ ব্যাপার নয়– বেশ মজার; তবে মাথা রাখার ভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে একজন। পায়ের নিচে মাথা রাখতে পারাও সৌভাগ্য।

কুঁজোদের কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করতে দেখে আমি সব সময়ই মুগ্ধ হই।

৮ বছর ধ'রে আন্দোলনের পর আন্দোলন, মিছিল, হরতাল, রক্তপাত, অজস্র আত্মোৎসর্গ, গণতন্ত্রের জন্যে প্রবল ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে সামরিক একনায়ক এরশাদকে হটিয়ে, ১৯৯০-এর ৬ ডিসেম্বরে, গরিব বাঙলাদেশ গণতন্ত্রের দিকে পা দেয়।

গণতন্ত্র, অত্যন্ত সুন্দর শব্দ; অনেকের স্বপ্ন ছিলো অবশেষে গণতন্ত্র এসে বুঝি ধরা দিলো বাঙলাদেশের আঁচলে। এজন্যে আন্দোলনকারীরা সৃষ্টি করেন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' নামের একটি উৎকট ধারণা, যার কাজ সুষ্ঠু শুদ্ধ নির্বাচন আয়োজন ক'রে রাজনীতিবিদদের গণতান্ত্রিক করকমলে গণতন্ত্রের শুভ্রপদ্মটি তুলে দিয়ে বিদায় নেয়া।

তারপর রাজনীতিবিদেরা চর্চা করতে থাকবে গণতন্ত্র : তারা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকবে অপ্রতিহতভাবে।

বাঙলাদেশে রূপসী গণতন্ত্র আবার দেখা দেয় ১৯৯১-এ।

১৯৯১-এর ২৭ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপি জেতে (তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান : বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ), এবং খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী হন ১৯ মার্চে।

কিন্তু গতন্ত্রের কী দুর্ভাগ্য ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারিতে খালেদা জিয়াকেই আয়োজন করতে হয় একটি অসহায় প্রহসনমূলক নির্বাচন, যাতে বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৯টি আসন লাভ করে।

গণতন্ত্র নিজের অপরূপ রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়।

তারপর আবার তীব্র আন্দোলন; তৈরি হয় 'জনতার মঞ্চ', যাতে যোগ দেয় আমলারা; এর ফলে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের স্মৃতি চিরকাল তাঁর মনে থাকবে।

গণতন্ত্র সাফল্যের দিকে দীর্ঘ পা ফেলে!

কিন্তু খালেদা জিয়া ও বিএনপি এটা ভোলে নি।

১৯৯৬-এর ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ জেতে (তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান : বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান), এবং শেখ হাসিনা জুনের ২৩ তারিখে প্রধান মন্ত্রী হন। বহু বছর পর ক্ষমতায় ফিরে আসে আওয়ামি লিগ ধন্য বোধ করে।

২০০১-এর ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে জেতে (তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান : বিচারপতি লতিফুর রহমান), এবং খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বার প্রধান মন্ত্রী হিশেবে শপথ গ্রহণ করেন ১০ অক্টোবরে।

এ-নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট এমন বিস্ময়কর গরিষ্ঠতা অর্জন করে যে সারাদেশ ভয়ে ও অভাবিতকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়; দু-দিন ধ'রে দেশে কবরের স্তব্ধতা বিরাজ করে।

পাখিরাও চুপ ক'রে যায়, আমার কাকগুলোও ডাকে না।

বিএনপি-জামাত জোটও এতোটা আশা করে নি, দেশ তো আশা করেই নি; তাই ফলাফলের প্রথম ঘা সহ্য করতে অন্তত দু-দিন সময় লাগে। তারপর শুরু হয় জয়ীদের তাণ্ডব।

নির্বাচন কি সুষ্ঠু হয়েছিলো? আমি তা জানি না; আমি তা কোনো দিন জানবো না। কেউ জানবে না।

হাসিনা যাকে মহান দেবদূত ভেবে বঙ্গভবনে নিয়ে এসেছিলেন, সে-দেবদূতও হাসিনার জন্যে কাল হয়ে উঠেছিলো। সেও এখন একটি ভিলেন, তার গোঁফ আর দেখা যায় না।

লতিফুর রহমানকে তো প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিলো ক্ষিপ্ত। প্রচণ্ড উত্তেজনা নিয়ে সে আসে। আর তার উপদেষ্টারাও কি ছিলো মহাপুরুষ? এই হঠাৎ মহাপুরুষদের হাতে কি দেশ ছেড়ে দেয়া যায়?

নির্বাচন যদি সুষ্ঠু হয়ে থাকে, তাহলে সে কেনো এতোটা নিন্দিত?

বাঙলাদেশের এখন যে-রাজনীতিক অবস্থা, তাতে তো ক্ষমতায় আসবে

বিএনপি (+রাজাকার জামাত), বা আওয়ামি লিগ (+রাজাকার জামাত)। রাজাকাররা এখন আমাদের প্রধান দুটি দলকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু বিএনপি (+রাজাকার জামাত) ক্ষমতায় আসে সবাইকে বিমূঢ় ক'রে।

বাঙলাদেশে কিছুই নিষ্কলঙ্ক থাকে না; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারাণাটিও আর নির্মল নেই। শাহাবুদ্দিন থেকে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান হয়ে লতিফুর রহমান পর্যন্ত পৌছোতে পৌছোতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারও হয়ে ওঠে দূষিত; লতিফুর রহমান যে-বিপুল উদ্যোগে ত্রাস জাগিয়ে নির্বাচন আয়োজন করে, তাতে সে এখন বাঙলাদেশে এক খলনায়কে পরিণত হয়েছে। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ও বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নিরাসক্তি ও নিরপেক্ষতা তার ছিলো না; মনে হয়েছে প্রচণ্ড ক্রোধ ও পরিকল্পনা নিয়ে সে নির্বাচনের আয়োজনে নেমেছে।

দেশকে সে উল্টেপাল্টে দেয়, এক দলের মাস্তানদের ঠাণ্ডা ক'রে আরেক দলের মাস্তানদের গরম ক'রে গণতন্ত্রের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে কাজ করতে দেয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এখন বাঙলাদেশের জন্যে সংকট হয়ে উঠেছে; রাজনীতিক দলগুলো তাকিয়ে থাকছে সেই অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দিকে, যাঁর সম্ভাবনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার। তাই প্রধান বিচারপতিরা, বিশেষ ক'রে, যাঁর সম্ভাবনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ার, তিনি আর নিরপেক্ষ থাকছেন না; নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয় বাঙলাদেশে।

১৯৯১-এর ১৯ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত সময়টি বঙ্গে গণতন্ত্রের কাল।

আমরা এখন গণতন্ত্রে ভাসছি।

কিন্তু আমরা কি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি?

গণতন্ত্রের নামে আমরা দেখছি নির্বাচিত স্বৈরশাসন। মুজিব, জিয়া, এরশাদ তাঁদের ছায়া ফেলে চলছে(ন) আজো।

আওয়ামি লিগ এখন ক্ষমতায় নেই, তার বিরুদ্ধে যা কিছু আমি লিখতে পারি; বিএনপি-জামাত এখন ক্ষমতায়, আমি কি এই সর্বশক্তিধরদের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে পারি?

১৯৯১ থেকে যা দেখে আসছি, তা এভাবে প্রকাশ করা যায় :

১: বিএনপি (+জামাত) ও আওয়ামি লিগ দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে নি। তারা সংসদে যায় না, গেলে হৈচৈ করে। তারা গণতন্ত্রের কোনো রীতিনীতি মানে না।

২: বিএনপি (+জামাত) ও আওয়ামি লিগ দেশে গুণ্ডাদের প্রাধান্য সৃষ্টি করেছে। গুণ্ডারাই দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। দেশের পথে পথে গুণ্ডা ছড়ানো, সাধারণ মানুষ বিপন্ন। আওয়ামি লিগ একটি ও আরো কয়েকটি জয়নাল হাজারি সৃষ্টি করেছিলো, বিএনপি (+জামাত) এখন

অসংখ্য জয়নাল হাজারি সৃষ্টি করেছে। দেশ এখন বিএনপি (+জামাত)-এর হাজারি ও লাখিতে ভ'রে গেছে।

৩: বিএনপি (+জামাত) ও আওয়ামি লিগ কোনো দলই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নি। জনগণের স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই, তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। পথে পথে পুলিশ ও গুণ্ডাদের, এবং অফিসে অফিসে আমলাদের অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ। আমলারা দুটি ব্যাপার শিখেছে– ওপরঅলাকে সেজদা করতে আর নিচঅলাকে লাথি দিতে; এবং ঘুষ খেতে।

৪: বিএনপি (+জামাত) ও আওয়ামি লিগ উভয়ই দুর্নীতিগ্রস্ত, তবে বিএনপি (+জামাত) দুর্নীতিতে যতোটা অবাধ, আওয়ামি লিগ ততোটা অবাধ হওয়ার সাহস অর্জন করে নি (১৯৭২-১৯৭৫-এর কথা তাদের মনে আছে)। এখন বিএনপি (+জামাত) ক'রে চলছে আওয়ামি লিগের দ্বিগুণ দুর্নীতি।

৫: আমলারা এভাবেই দূষিত; বিএনপি (+জামাত) ও আওয়ামি লিগ তাদের আরো দূষিত করেছে, আমলারা তাদের প্রভুভক্তির জন্যে পুরস্কার পাচ্ছে, অভক্তির জন্যে দণ্ডিত হচ্ছে। দণ্ড ও পুরস্কার দানের ব্যাপারে বিএনপি (+জামাত) আওয়ামি লিগকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে গেছে।

৬: বিএনপি (+জামাত) ও আওয়ামি লিগ উভয়েই প্রতিক্রিয়াশীল, তবে বিএনপি (+জামাত) অতিশয়, চরমভাবে, প্রতিক্রিয়াশীল। বিএনপি (+জামাত) মুক্তচিন্তায় একেবারেই বিশ্বাস করে না, তারা মুক্তচিন্তাকে দমন করে, মুক্তচিন্তাশীল বই নিষিদ্ধ করে, আওয়ামি লিগ মোটামুটি মুক্তচিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়।

৭: বিএনপি (+জামাত) সাম্প্রদায়িক, আওয়ামি লিগ সাম্প্রদায়িক নয়, এটাই অবশ্য আওয়ামি লিগের দোষ ব'লে গণ্য করা হয়। ২০০১-এর নির্বাচনের পর বিএনপি (+জামাত) যে–ধর্ষণ-পীড়নের অভিযান চালায়, তা ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে দোষ দেয়া হয় আওয়ামি লিগকে– জনগণ চুপ ক'রে থাকে।

৮: আওয়ামি লিগের নেত্রীকে, হাসিনাকে, সমালোচনা করা যায়, যা তা বলা যায়, গালাগালিও করা যায়, তিনি সামান্য নারী, সামান্য মুজিবের কন্যা; বিএনপির নেত্রী, খালেদা জিয়া, অসামান্য, অলৌকিক, তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে, তাঁর সম্পর্কে কিছু বলা ব্লাস্ফেমি।

কেউ ভয়েও তাঁর সম্পর্কে কোনো বক্র মন্তব্য করার সাহস করে না; অনেক আগে আমি একবার করেছিলাম, আমার দুই হাত কেটে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছিলো। আমি অবশ্য চাই না বিএনপি (+জামাত)-এর গণতন্ত্র আমার একটি আঙুলও কাটুক।

৯: বিএনপি (+জামাত) দুর্ধর্ষ, তারা শক্ত হাতে যে-কোনো অপকর্ম করতে পারে, আওয়ামি লিগ তা করার সাহস করে না। ১৯৭২-১৯৭৫-এর কথা মনে ক'রে তারা ভয় পায়।

১০: বিএনপি (+জামাত) দখলে অদম্য ও দুর্ধর্ষ; ২০০১-এর নির্বাচনের পর তারা ঢাকা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পৌরশৌচাগার পর্যন্ত অবিলম্বে দখল করেছে, একটুও সময় নেয় নি।

আওয়ামি লিগ এতোটা করার সাহস পায় নি। ১৯৯৬-এ ক্ষমতায় এসে তারা উপাচার্যদের গলাধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় নি, সময় মতো নির্বাচন ক'রে নতুন উপাচার্য নিয়োগ করেছে।

১১: বিএনপি (+জামাত) নিজেদের লোকদের ক্ষমতায় বসাতে কোনো দ্বিধা করে না, এক মুহূর্তও দেরি করে না; এবার ক্ষমতা পাওয়ার পর একেবারেই দেরি করে নি, সব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যেখানে যাকে ইচ্ছে বসিয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

আওয়ামি লিগ দ্বিধা ক'রে ক'রে তাদের অনেক অনুগতকে শেষ পর্যন্তও কিছু দেয় নি, তারা তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে, তারা গণতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে নি।

১২: আওয়ামি লি া ভয়ে মন্ত্রীসভা বড়ো করতে পারে নি, অনেককে উপমন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ক'রে রেখেছে; কিন্তু বিএনপি (+জামাত) মহাজগতের বৃহত্তম মন্ত্রীসভা, ৬০ না ৭০ না ৮০ না ১০০– আমার মনে নেই, মনে রাখার কোনো দরকারও নেই– স্থাপন ক'রে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তারা কোনো কিছুকে পরোয়া করে না। যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রী সম্ভবত ১০/১২জন, যুক্তরাজ্যেও সম্ভবত ১০/১২জন, জার্মানিতেও সম্ভবত ১০/১২ জন, আর বাঙলাদেশে এখন আছে বিশ্বের বৃহত্তম মন্ত্রীসভা। এদিক দিয়ে বিএনপি (+জামাত)-এর বাঙলাদেশ এখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র।

১৩: বিএনপি (+জামাত) তাদের রাষ্ট্রপতির বেয়াদপি সহ্য করে না ও করে নি; কয়েক মাসের মধ্যেই রাষ্ট্রপতিকে বের ক'রে দিয়ে দেখিয়েছে তাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ কতো অসাধারণ, আর আওয়ামি লিগ তাদের খল রাষ্ট্রপতিকে সহ্য করেছে বছর বছর, এবং তার ফল পেয়েছে।

এখনকার রাষ্ট্রপতিটি অভাবিত চাকুরিটি পেয়ে প্রধান মন্ত্রী ও আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে(ন)। রাষ্ট্রপতিদের ভাষিক ধারা বর্তমান রাষ্ট্রপতি চমৎকারভাবে রক্ষা করেছে(ন), এজনও বাঙলা বা ইংরেজি শুদ্ধভাবে পড়তে, লিখ তে, ও বলতে পারে(ন) না।

এজন জানে(ন) বোবার শত্রু নেই।

১৪: বিএনপি (+জামাত) আল্লার আশীর্বাদপ্রাপ্ত, তাদের অপরাধকে জনগণ মনে করে সুকর্ম, জনগণ তা দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেয়; আওয়ামি

লিগের অপরাধকে জনগণ মনে করে কুকর্ম, মানতে চায় না।

আওয়ামি লিগ ১০০ টাকা চুরি করলে জনগণ মনে করে তারা ১০০ কোটি টাকা চুরি করেছে, আর বিএনপি ১০০ কোটি টাকা চুরি করলে জনগণ মনে করে বিএনপি ঠিক কাজই করেছে।

বিএনপি (+জামাত)-এর নেতারা মদ খেলে বা নারীচর্চা করলে জনগণ মনে করে তারা ধর্ম চর্চা করে, আওয়ামি লিগ নামাজ পড়লে হজ করলে জনগণ মনে করে তারা ভণ্ডামো করছে।

১৫: বিএনপি (+জামাত) অসংস্কৃত– শব্দটি তারা হয়তো বুঝবে না; সাহিত্য-শিল্পকলার প্রতি তাদের বিরাগ রয়েছে, তাই তাদের সঙ্গে প্রকৃত সাহিত্যিক-শিল্পীরা নেই, যারা আছে তারা তুচ্ছ: আওয়ামি লিগের সঙ্গে অন্তত কিছু প্রকৃত সাহিত্যিক-শিল্পী আছেন।

তবে দলীয় সাহিত্যিক-শিল্পীরা দালালমাত্র, রক্ষিত, তাদের কাজ হয়ে ওঠে শ্লোগান দেয়া, সুবিধা নেয়া, নিজেদের দলীয় অঙ্গনায় পরিণত করা। আওয়ামি লিগের সাহিত্যিক-শিল্পীরা আওয়ামি লিগের জন্যে বিপদ; আর বিএনপি (+জামাত)-এ যারা আছে, তারা পেছনের সারির শ্লোগানদাতা ও খিলজীয় মল্লযোদ্ধা– এদের মধ্যে একগুচ্ছ প্রাক্তন উপাচার্যও আছে।

রাজনীতি আমাদের সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন দলের পাঁচ টাকা দামের প্রমোদবালকে পরিণত করেছে।

বিএনপি (+জামাত)-এর লেখক-বুদ্ধিজীবীরা এখন প্রচুর বই লিখছে, দিনরাত লিখছে, পাঠকেরা ওগুলো না কিনলেও, সরকারি প্রকল্পে ওগুলোর হাজার হাজার কপি কেনা হবে। আওয়ামি লিগের কালেও আওয়ামি লেখক-বুদ্ধিজীবী-মন্ত্রী-আমলারা বেস্টসেলার লিখেছিলো, প্রকল্পের জন্যে। এখন তারা লিখছে না, লিখছে বিএনপি (+জামাত)-এর লেখকেরা, যাদের অধিকাংশ শুদ্ধভাবে একটি অনুচ্ছেদও লিখতে পারে না।

তারা খালেদা ও জিয়া, তাঁদের রাজনীতি ও দর্শন, সম্পর্কে অজস্র বেস্টসেলার লিখছে। অপাঠ্য ওই আবর্জনারাশি প্রকল্পের টাকা দিয়ে কেনা হবে; দেশের পাঠাগারগুলো আবর্জনায় ভ'রে উঠবে। আগামী পাঁচ বছরে আমরা দেখতে পাবো বিএনপি (+জামাত)-এর গাজ্জালিরা কয়েক শো টন আবর্জনা উৎপাদন ক'রে দেশের পাঠাগারগুলো ভ'রে ফেলেছে।

১৬: বিএনপি (+জামাত)-এর সময় বেশ ভয়ের মধ্যে বাস করার সুখ পাওয়া যায়, প্রতিটি কর্মকর্তা ও সাধারণ মানুষ এখন ভয়ের মধ্যে বাস ক'রে সুখে আছে; ১৯৯৬-এর পর আওয়ামি লিগের সময়ে এমন ভয়ের সুখ ছিলো না।

তখন কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে হাসিনাকে গালি দিয়ে গৌরব বোধ করতো, কিন্তু এখন সচিবটচিবরা চুপ ক'রে গেছে, বা মহামান্য বা মাননীয় বিশেষণ

ছাড়া খালেদা জিয়ার নাম নেয় না। আওয়ামি লিগ চুক্তিভিত্তিতে কাউকে নিয়োগ করলে তা হতো অপরাধ, আর বিএনপি (+জামাত) চুক্তিভিত্তিতে অনুগত অপদার্থ ও গুণ্ডাদের নিয়োগ ক'রে চলছে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যে। তরুণতরুণীরা বেকার থাকছে, বুড়োরা চুক্তিভিত্তিতে কর্মযোগী হয়ে উঠছে। 'চুক্তি' কথাটি শুনলেই আমার বমি আসে, নিশ্চয়ই চুক্তিতে একটা শর্ত থাকতে হবে– 'সকাল-সন্ধ্যা পা চাটতে হবে'।

১৭: আওয়ামি লিগ যাই করতো, তাই ছিলো স্বজনপ্রীতি; আর বিএনপি (+জামাত) স্বজনে অলিগলি মন্ত্রীসভা কলেজ ইস্কুল ভ'রে ফেলছে, তা হচ্ছে যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ। এটা স্বজনপ্রীতি নয়, এটা হচ্ছে বাঙলাদেশের কল্যাণের জন্যে প্রতিভার সদ্ব্যবহার। সৌদি আরবে যেমন সব বড়ো পদেই প্রিন্সরা, এখন বাঙলাদেশেও সব বড়ো পদেই বিএনপি (+জামাত)-এর প্রিন্স ও প্রিন্সেসরা।

১৮: আওয়ামি লিগের (১৯৯৬-২০০১) সময় কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ছিলো এখানে সেখানে, বিএনপি (+জামাত) ওই জিনিশটাকে দেশ থেকে দূর করেছে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে।

এবার বইমেলায় দেখা গেলো বাঙলা একাডেমির মহাপরিচালককে একটি তুচ্ছ কর্মচারীতে পরিণত করা হয়েছে, যদিও ভদ্রলোক বিএনপিকে সেবার জন্যে একবার মার খেয়েছিলেন, আহত হয়েছিলেন, এবার তিনি তুচ্ছ চাকুরিটি ফিরে পেলেও তাঁর তুচ্ছতা কাটে নি।

বিএনপির অধীনে দু-তিনজন ছাড়া সবাই তুচ্ছ।

একটি বেশ মুক্ত, আধুনিক ও জনপ্রিয় উপগ্রহ চ্যানেল ছিলো ইটিভি– বিএনপির কর্মীরাও এটিকে পছন্দ করতো– এটি নিয়ে এসেছিলো মুক্তি ও শিল্পকলা; বিএনপি (+জামাত) এতো মুক্তি এতো শিল্পকলা সহ্য করতে পারে নি, এটিকে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, অন্যান্য চ্যানেলগুলোকে পরিণত করা হয়েছে ক্লিষ্ট ক্লান্তিকর বিটিভিতে।

১৯: বিএনপি ইন্টারনেট চালু হ'তে দেয় নি বাঙলাদেশে, দুশ্চরিত্র বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বাঙলাদেশিদের দুশ্চরিত্র করে ব'লে দেশটিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিলো বিশ্ব থেকে– খুব ভালো ছিলো তখন, বদ্ধ কারাগারই ভালো বাঙলাদেশের জন্যে; আওয়ামি লিগ এটা চালু ক'রে ভালো কাজ করে নি। এর ফলে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

'ভাবমূর্তি' (এটি একটি পৌত্তলিক শব্দ) শব্দটি আমিই বোধ হয় প্রথম ব্যবহার করেছিলাম *নারী* বইতে (বইটি দয়া ক'রে নিষিদ্ধ করেছিলো বিএনপি– ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার অল্প আগে), *ইমেজ*-এর বাঙলা হিশেবে, বিএনপি (+জামাত) এটি গ্রহণ করেছে।

এমন পৌত্তলিক শব্দ বিএনপি (+জামাত) সরকার কী ক'রে ব্যবহার

করে? এটা তো কবিরা গুনার সমান।

২০: আওয়ামি লিগের সময় সাধারণ মানুষের অবস্থা একটু ভালো ছিলো, এখন তা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। সব কিছুর দাম বেড়েছে, কিন্তু কথা বলতে কেউ সাহস করছে না। আওয়ামি লিগ বাড়ালে এতো দিনে হাসিনার রাস্তায় বেরোনো কঠিন হতো।

২১: বিএনপি (+জামাত) ও আওয়ামি লিগ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, জনগণের কথা ভাবার সময় তাদের নেই। লাখ লাখ শিক্ষিত তরুণতরুণী কর্মহীন হয়ে প'ড়ে থাকছে, এনজিওগুলোতে (যেখানে কাবুলিয়ালারা দেখা দিয়েছে অর্থনীতিবিদরূপে, এবং মাসে মাসে নোবেল প্রাইজ পেয়ে চলছে) দাসদাসী-বিনোদনকারীর কাজ করছে, আর দু-তিন কোটি নিরক্ষর তরুণতরুণীর কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এ নিয়ে তাদের কোনো উদ্বেগ নেই।

ওই তরুণদের সরকার ছিনতাইকারীতে পরিণত করেছে, কেননা দেশের মূলতন্ত্র হচ্ছে ছিনতাইতন্ত্র।

মেয়েদের তারা কী ক'রে তুলছে?

২২: বিএনপি (+জামাত)-এর মহান ছাত্রনেতারা, অল্প বয়সেই কোটিপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও শিক্ষা দিচ্ছে; শিক্ষকেরা ক্লাশে কী বলবে বা বলবে না, তাঁরা তা শিখিয়ে দিচ্ছেন। ছাত্রনেতারা বা বিএনপি-জামাতের দুর্ধর্ষ কর্মীরা এখন শিক্ষকদের শিক্ষক।

তাঁদের কথা না শুনলে শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে হচ্ছে। তাঁদের কথা তো শুনতেই হবে, ভবিষ্যতে তাঁরাই তো হবেন মাননীয় মন্ত্রী। মহান ছাত্রনেতাদের অনেকেই এখন বৃদ্ধ। হাসিনার সময় নির্দ্বিধায় আমি হাসিনা সম্পর্কে কথা বলেছি, খালেদা জিয়া সম্পর্কে এখন থেকে আমাকে সাবধানে কথা বলতে হবে।

২৩: বিএনপি (+জামাত) চেষ্টা করছে জিয়া রাজবংশের একজন যুবরাজ তৈরি করার, যিনি ভবিষ্যতে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তাঁর মেধা ও বিচক্ষণতার স্তবে মন্ত্রীরা মুখর হয়ে উঠেছে। আমি তাঁর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছি।

দেয়ালে দেয়ালে তাকে ঘোষণা করা হচ্ছে 'ভবিষ্যতের/আগামীর রাষ্ট্রনায়ক'; আওয়ামি লিগ এটা করে নি; আওয়ামি লিগের এখনো কোনো যুবরাজ তৈরি হয় নি। আওয়ামি লিগের হয়তো ভবিষ্যৎ নেই।

দেয়ালের লেখা দেখে জনগণ সুখী বোধ করছে, সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হচ্ছে, গুণ্ডারা 'বায়ুগৃহে' গিয়ে ভবিষ্যতে মন্ত্রী হওয়ার পথ তৈরি করছে; আওয়ামি লিগ জনগণকে এ-সুখ দিতে পারে নি।

বাঙলাদেশের কপালে কী লেখা আছে, তা আল্লাই জানে।

২৪: প্রতিহিংসা ও হিংস্রতায় (বা ক্ষমা ও প্রেমপ্রীতিতে), ২০০১-এ নির্বাচিত হওয়ার পর, বিএনপি (+জামাত) যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তার কোনো তুলনা নেই। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে এটা দরকার, হিংস্রতা ছাড়া তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্র আসে না। ধর্ষণে ও হত্যায় বিএনপি (+জামাত)-এর স্বাস্থ্যবান কর্মীমণ্ডলি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে (অর্থাৎ বিএনপি (+জামাত) পৌরুষসম্পন্ন), এর জন্যে তাদের আরো ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা দরকার। অবশ্যই থাকবে।

তারা অনুসরণ করেছে মহৎ মুসোলিনি-হিটলার-সাদ্দাম-লাদেনের মহৎ আদর্শ, গণতন্ত্রের জন্যে এটা দরকার।

এর পর যদি আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসে (আল্লা নিশ্চয়ই তাদের ক্ষমতায় আসতে দেবেন না), তখন সাধারণ মানুষ কী করবে, সেকথা ভেবে আতঙ্কিত বোধ করছি।

২৫: জনগণ এর মাঝেই হতাশ হয়ে উঠেছে। একে কি বলবো হতাশা? জনগণ বোবা হয়ে গেছে, অন্ধ-বধির-বোবা হয়ে গেছে। কিন্তু জনগণ দুষ্ট আওয়ামি লিগের থেকে দুষ্টতর বিএনপি (+জামাত)কে বেশি পছন্দ করে!

২৬: খালেদার একটি দিক খুব ভালো, তাঁকে ডক্টরেট রোগে ধরে নি; হাসিনা ডক্টরেট রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। খালেদার আরেকটি দিক ভালো– তাঁকে যা শিখিয়ে বা লিখে দেয়া হয়, তিনি তাই বলেন ও পড়েন; হাসিনা একটু বেশি কথা বলেন ও রসিকতা করেন। হাসিনার বোঝা উচিত যে বাঙালি মুসলমান রসিকতা বোঝে না; তারা পদধূলি বোঝে।

২৭: শোনা যায় 'হাওয়া ভবন' ব'লে একটি অট্টালিকা বিএনপি (+জামাত)-এর কালে প্রকৃত রাজধানি হয়ে উঠেছে বাঙলাদেশের; আওয়ামি লিগ এমন একটি 'বায়ুগৃহ' তৈরি করতে পারে নি। তবে 'হাওয়া' শব্দটি একই সঙ্গে সুখকর ও ভীতিকর, 'হাওয়া হয়ে যাওয়া' বাগ্বিধিটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত।

২৮: বিএনপির একটি সুবিধা হচ্ছে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান নেই, আওয়ামি লিগের একটি সংকট হচ্ছে ওয়াজেদ মিয়া আছেন।

তালিকা আর বাড়াতে চাই না, একদিন হয়তো বিস্তৃত তালিকা তৈরি করবেন কোনো প্রকল্পপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক।

গণতন্ত্র হচ্ছে চূড়ান্ত ব্যক্তি-অধিকারের তন্ত্র : গণতন্ত্র ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতার তন্ত্র। গণতন্ত্রে সরকার বা রাষ্ট্র বা সমাজ প্রধান নয়, সমাজ বা রাষ্ট্র প্রধান ছিলো সামন্ততন্ত্রে; গণতন্ত্রে প্রধান হচ্ছে ব্যক্তি; ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার নিশ্চিত করা গণতন্ত্রের কাজ। আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তিটি– 'গভর্নমেন্ট অফ দি পিপল, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল'–

আমি উদ্ধৃত করতে চাই না, কেননা বাঙলাদেশ তাঁর উক্তিটিকে অসার প্রমাণ করেছে। শুধু অসার নয়, মিথ্যেও প্রমাণ করেছে।

লিংকন একটু বেশিই আশা পোষণ করেছিলেন যে এ-ধরনের সরকার 'শ্যাল নট পেরিশ ফ্রম দি আর্থ'– কিন্তু আমরা কি দেখছি না যে তা ম'রে অনেক আগেই কবরে প'চে গেছে? বরং আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারগুলো বিশ্বাস করে রজার্সের সংজ্ঞায় যে 'গণতন্ত্র হচ্ছে সে-ধরনের সরকার, যাকে চার(পাঁচ) বছর ক্ষমতায় রাখতেই হবে, ওই সময়ে তারা যা-ই করুক না কেনো'। তারা রজার্সের কথা মেনে যা ইচ্ছে, তা করছে। তবে বিএনপি (+জামাত)-এর রাশিচক্রে পাঁচ বছরের কথা সম্ভবত নেই।

গণতন্ত্রে একটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত থাকে, সেটি হচ্ছে যে তার কোনো কাজ অন্যের জন্যে ক্ষতিকর হবে না।

ব্যক্তি স্বাধীন, তবে অন্যের ক্ষতি করার অধিকার তার নেই।

তার অধিকার কেউ খর্ব করবে না, সেও খর্ব করবে না অন্যের অধিকার। সে কারো দাস নয়, অন্য কেউ তার দাস নয়।

ব্যক্তিকে কোনো কট্টর, উগ্র, বদ্ধ ভাবাদর্শে দীক্ষিত করা গণতন্ত্রের কাজ নয়। এটা গণতন্ত্রের রীতিবিরোধী। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার ছাড়া গণতন্ত্রের আর কোনো ভাবাদর্শ নেই।

কিন্তু বাঙলাদেশে গণতন্ত্রের বদলে উগ্র ভাবাদর্শই প্রধান হয়ে উঠেছে; বিএনপি (+জামাত) একমাত্র ভাবাদর্শ ক'রে তুলেছে ইসলামকে। এর সাহায্যে দরিদ্র, নিরক্ষর, নিরধিকার মানুষদের ঠকানো সহজ; কেননা ধর্ম সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ও আপত্তি করা চলে না। এটা গণতন্ত্রের জন্যে কল্যাণকর নয় (বা হয়তো কল্যাণকর!)।

১ অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনের পর দু-দিন ধ'রে কবরের স্তব্ধতা নেমেছিলো; বাতাসও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বাঙলাদেশের নিশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, তবে বাঙলাদেশ আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। কবরে জেগে ওঠে সক্রিয়দের হিংস্রতা।

বিএনপি (+জামাত) প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের (বা ক্ষমা ও প্রেমপ্রীতির) আগুনে দাউদাউ জ্ব'লে ওঠে; ধর্ষিত হয় হাজার হাজার হিন্দু নারী, গৃহহীন হয় অজস্র হিন্দু; এমনকি মুসলমান আওয়ামি লিগ চেয়ারম্যানেরাও তাদের এলাকায় থাকতে পারে নি। যারা ছিলো প্রতাপশালী, তাদেরই যখন এ-অবস্থা, তখন অন্যদের কী কথা।

মহান আজরাইল নেমে এসেছিলেন বাঙলাদেশে।

কিন্তু দেশের ভাবমূর্তি বা নিজের দেহমূর্তি নষ্ট হবে ভেবে আমরা কথা বলি নি। বোবার শত্রু নেই, যদিও এখন বোবারও শত্রু আছে। এখনো কথা বলি না; বিএনপি (+জামাত)-এর বিরুদ্ধে কে কথা বলতে পারে?

তাই আমরা কথা বলি না, বললে স্তব করি।

সন্ত্রাস ও ধর্ষণ হয়ে উঠেছিলো, এখনো চলছে, বাঙলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক কর্মকাণ্ড। আওয়ামি লিগের সময় কিছু হাজারি ছিলো, হাসনাত আবদুল্লার পুত্র ছিলো, এবং আরো ছিলো। আওয়ামি গুণ্ডাদের সন্ত্রাসই ছিলো আওয়ামি লিগের পতনের মূলে। আমাদের সব দলই সন্ত্রাসী– সব দলই দুর্বৃত্তদের সংঘ, আওয়ামি লিগের গুণ্ডাদের সন্ত্রাসেও জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু ক্ষমতালাভের পর বিএনপি (+জামাত) যে-সন্ত্রাস (বা ক্ষমা ও প্রেমপ্রীতি) চালায়, তা পরের সরকারগুলোর জন্যে আদর্শকাঠামো হয়ে থাকবে।

পরবর্তীরা হয়তো এ-কাঠামোতেই সন্ত্রাস (বা ক্ষমা ও প্রেমপ্রীতি) চালিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

সন্ত্রাসীর গুলিতে শিশু নিহত হ'লে বিএনপির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছে, 'আল্লার মাল আল্লায় নিয়ে গেছে।' তার ধর্মবিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি, সবাই মুগ্ধ হয়েছে, বিশ্বাসের, নিয়তিবাদের, এমন শুদ্ধতাই তো আমরা চাই; আল্লায় একদিন নিশ্চয়ই তাকে বেহেস্ত নসিব করবেন।

সে বলেছে– আমার যতোটা মনে পড়ছে– 'দেশে খুন বেড়েছে, অপরাধ বাড়ে নি', 'মানুষের মধ্যে আতঙ্ক নেই, অস্বস্তি আছে'।

রাজনীতি ছেড়ে ফ্যাশিবাদী গথিক উপন্যাস লিখলে ভদ্রলোক সফল হবে, বেস্টসেলারে বাঙলা সাহিত্য ভ'রে উঠবে।

বিএনপি ভুলতে পারে নি 'জনতার মঞ্চ'-এর কথা। মহিউদ্দিন খান আলমগিরকে শিক্ষা দিতে গিয়ে একের পর এক শিক্ষা দিয়েছে লেখক-সাংবাদিকদের : শাহরিয়ার কবির, ডঃ মুনতাসীর মামুন, সালিম সামাদ, এনামুল হক চৌধুরী এবং আরো অনেককে। লেখক-সাংবাদিক-অধ্যাপকেরা শিক্ষিত হয়ে ওঠে নি, তাদের অবশ্যই ভালোভাবে শিক্ষা দেয়া দরকার; পিষে পিষে শিক্ষা দেয়া দরকার! এটা হচ্ছে লেখক-সাংবাদিক-অধ্যাপকদের শিক্ষালাভের কাল।

তবে বিএনপির বোন মেরি পিটার্সও আর বিএনপি (+জামাত)কে রক্ষা করতে পারে নি।

বিএনপি (+জামাত) রূপসী বাঙলার ভাবমূর্তি রূপসী রাখতে পারে নি।

'মধ্যপন্থি মুসলমানের দেশ' থেকে এটি এখন, যুক্তরাষ্ট্রে, হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসী কালোতালিকাভুক্ত দেশ। বিএনপি (+জামাত)-এর গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্যে বাঙলাদেশি বাঙালিদের যুক্তরাষ্ট্রে ও ইউরোপে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, মনে করে সম্ভাব্য তালেবান, যদিও তাদের একটি বড়ো অংশ তালেবানি ধর্মান্ধ উগ্রতার বিরোধী।

তবে অনেকেই যে তালেবানপন্থি, এতে সন্দেহ নেই। আমরা কি শুনি

নি সেই সুমধুর শ্লোগান– 'আমরা হবো তালেবান, বাঙলা হবে আফগানিস্তান?' বা 'আমরা সবাই তালেবান, বাঙলা হবে আফগান'? মানুষ কতোটা দূষিত আর নষ্ট হ'লে বাঙলাদেশের মতো শস্যশ্যামল সুন্দর দেশকে অভিশপ্ত আফগানিস্তানে পরিণত করতে চায়? ওটি কি কোনো বাসযোগ্য দেশ, যেখানে অনেক বছর ধ'রে বৃষ্টিও হয় না? ওটি তো প'ড়ে আছে প্রস্তর যুগে।

সিআইএ আর কতোটা সংবাদ রাখে! সিআইএ সব সংবাদ রাখলে কি আর টুইন টাওয়ার ধ্বংস হতো?

আমরা জানি মানুষ কেমন স্বর্গে আছে বাঙলাদেশে। বাঙলাদেশের প্রতিটি বর্গমিটার এখন ভয়ের এলাকা। ঘরে থাকবো? ভয়। রাস্তায় বেরোবো? ভয়। সেতু পেরোবো? ভয়। নদীর তীরে দাঁড়াবো? ভয়। মেঘের দিকে তাকাবো? ভয়। কথা বলবো? ভয়। পুলিশেরা? ভয়। সৈনিকেরা? ভয়। আমলারা? ভয়। রাজনীতিকেরা? ভয়। তাদের গুণ্ডারা? ভয়। বাঙলাদেশ এখন শিহরণজাগানো ভয়ের এলাকা।

ভয়, ভয়, ভয়– এই এখন বাঙলাদেশ।

ক্ষমতায় (২০০১) আসার পর বিএনপি (+জামাত) অনেক মহৎ কাজ করেছে, সবটাই ত্রাসের; তবে তাদের মহত্তম কর্মকাণ্ড হচ্ছে *অপারেশন ক্লিন হার্ট* বা 'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ প্রক্রিয়া'। *অপারেশন ক্লিন হার্ট* নামটিই আপত্তিকর, এর নামের মধ্যেই আছে একটি ভীতিকর ব্যঞ্জনা; নামটিই দ্যোতনা করে যে এর কর্মকাণ্ড হবে নির্দয় নির্মম।

অপারেশন ক্লিন হার্ট-এর মতো সন্ত্রাসের ঝড় বাঙলাদেশ অনেক বছর দেখে নি। এটা পাড়া বা মহল্লার সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড নয়, এটি হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ভয়ে জনগণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সন্ত্রাস দমনের নামে এটি ছিলো চূড়ান্ত সন্ত্রাস। এতে ৫৮ জনের মতো বাঙলাদেশির করুণ মৃত্যু ঘটেছে, বিকলাঙ্গ হয়েছে কয়েক হাজার বাঙালি/বাঙলাদেশি। তারা সবাই সন্ত্রাসী ছিলো না। সন্ত্রাস দমনের অর্থ এই নয় যে যাকে-তাকে ধরা, এবং তাকে চূড়ান্তরূপে সমাধান করা।

বিএনপি (+জামাত)-এর *অপারেশন ক্লিন হার্ট*কে কি তুলনা করবো হিটলারের গেস্টাপোদের ঝঞ্ঝার সঙ্গে?

বিএনপি (+জামাত)-এর *অপারেশন ক্লিন হার্ট*কে কি তুলনা করবো পাকিস্তানিদের আলবদর/আল শামসের জবাইকাণ্ডের সঙ্গে?

বিএনপি (+জামাত)-এর *অপারেশন ক্লিন হার্ট*কে কি তুলনা করবো ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কর্নেল-মেজরদের বধযজ্ঞের সঙ্গে? এটির সঙ্গেই এর মিল বেশি; এরাও ওই ঘাতকদের মতো রক্ষিত 'দায়মুক্তি' অধ্যাদেশ– খুনের অধিকার– দিয়ে। এটা যদি একটি ভালো কাজ হয়, তাহলে একে

কেনো রক্ষা করতে হবে 'দায়মুক্তি' অধ্যাদেশ দিয়ে?

সন্ত্রাস দমন আমরা অবশ্যই চাই, কিন্তু সন্ত্রাস দমনের নামে সরকারি সন্ত্রাস চাই না। কোনো সামরিক শাসনের সময়ও সেনাবাহিনী এমন হিংস্রতা দেখায় নি, যা দেখিয়েছে ২০০২-এ, এবং এতোটা কলঙ্কিত হয় নি। বিএনপি (+জামাত) সেনাবাহিনীর মুখে কালিমা লেপে দিয়েছে। এটা ছিলো বিএনপি (+জামাত)-এর 'ব্লিট্স্ক্রীক'– তার নির্মম শিকার হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ ক'রে, বিএনপি (+জামাত) যাদের শিকার করতে চেয়েছে। এটা দেখে আমরা ভয়ে শিউরে উঠেছি, কথা বলতে পারি নি; কেননা কথা বলার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

সন্ত্রাস করে কারা, এবং কেনো করে?

সন্ত্রাসীরা সবাই কোনো-না-কোনো রাজনীতিক দলের কর্মী; সময় বুঝে তারা দল বদল করে। আমাদের রাজনীতিকেরা যেমন নিজেদের স্বার্থে দল বদল ক'রে আসছে ১৯৭৫ থেকে, সন্ত্রাসীরাও তাই করে।

সন্ত্রাস শুধু খুনে সীমাবদ্ধ নয়; এর এক চরম রূপ ধর্ষণ।

বাঙলার নারীরা এখন বাস করছে ধর্ষকদের উদ্যত শিশ্নের ছায়ার নিচে; তারা আতঙ্কে শিউরে থাকে সব সময়।

সন্ত্রাসীরা সাধারণ পুরুষ নয়, সন্ত্রাসীরাই একদিন বিবর্তিত হ'তে হ'তে মন্ত্রী হয়ে ওঠে, তারপর নতুন সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে।

সন্ত্রাসের রয়েছে সামাজিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, ধর্মীয় কারণ।

৫৬,০০০ বর্গমাইলের একটি ছোট্ট দেশ ১৫ কোটি মানুষের ভার বইতে পারছে না। এখানে থাকা উচিত ছিলো ১৫ লক্ষ মানুষ। রাজনীতি ও দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে সন্ত্রাসীদের।

দেশে অন্তত ৮ কোটি তরুণতরুণী রয়েছে, কোনো সরকার তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে নি। তারা কী করবে? তরুণীরা না হয় চেপে রাখে তাদের কষ্ট, কিন্তু তরুণরা? তারা ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেয়, এবং দেখতে পায় টাকা অর্জন কতো সহজ। একটি কাটা রাইফেল, ছুরিকা, বা পিস্তল; তার অর্থ অঢেল টাকা। আমাদের মন্ত্রীরা, আমলারা, ব্যবসায়ীরা, শিল্পপতিরা, দারোগারা, কাস্টমসরা কি সন্ত্রাসী নয়?

৩২,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে নিয়ে কারা ঋণখেলাপি হয়েছে? এরা কি সন্ত্রাসী নয়? পথে কারো পকেট থেকে ১০০ টাকা ছিনতাই করা খুব খারাপ, ব্যাংক থেকে ৩২,০০০ কোটি টাকা ছিনতাই চমৎকার।

আরেক দল আছে নিম্নমানের ছিনতাইকারী। তারা কোনো দলের বড়ো গুণ্ডা হ'তে পারে নি; হয়েছে ছিনতাইকারী।

এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী আমাদের সরকারগুলো। তাদের দায়িত্ব

এদের জীবিকার ব্যবস্থা করা; তা না ক'রে সরকারগুলো এদের গুণ্ডা ও ছিনতাইকারীতে পরিণত করেছে।

তরুণীদের কী করেছে?

সন্ত্রাসী ধরতে হ'লে প্রথম ধরতে হবে সরকারগুলোকে।

২০০১-এর নির্বাচনে জেতার পর থেকে সন্ত্রাস বেড়ে যায় বহুগুণে, যদিও সন্ত্রাস নির্মূল করাই ছিলো বিএনপি (+জামাত)-এর প্রধান শ্লোগান; কিন্তু বিএনপি (+জামাত)-এর ক্ষমতায় আসার পর একটি-দুটি জয়নাল হাজারির জায়গায় দেখা দেয় বিএনপি (+জামাত)-এর অজস্র জয়নাল হাজারি। আগে আমি আওয়ামি লিগের অনেক গুণ্ডাকে অনেক ধমক দিয়েছি, অনেকে আমাকে চিনেছে, তারা ভয় পেয়েছে; কিন্তু বিএনপি (+জামাত)-এর গুণ্ডাদের ধমক দিতে আমি ভয় পাই।

২০০২-এর ১৭ অক্টোবরে বিএনপি (+জামাত) সরকার ৪০,০০০ সেনাসদস্য নিয়োগ করে সন্ত্রাস দমন ক'রে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে।

এ-বিপুল বিরাট সংখ্যা দেখে মনে হয় বিএনপি (+জামাত) একটি দেশ জয় করতে নেমেছে, দেশটির নাম বাঙলাদেশ; এবং দেশটিকে আক্রমণ করেছে অতর্কিতে, কোনো ঘোষণা না দিয়েই। বিএনপি (+জামাত) সরকার কাজটি শুরু করে গভীর রাতে; কেউ জানতো না যে শান্তির দূত সশস্ত্রবাহিনী পথে নামবে। মহাকাব্যে রাত সাধারণত চক্রান্তের কাল; দেবতারা রাতেই চক্রান্ত করে মহাকাব্যে। বিএনপি (+জামাত)-এর কালটিও সম্ভবত মহাকাব্যিক। জনগণ এক ভোরে উঠে দেখে তারা আক্রান্ত, তাদের সবাইকেই মনে করা হচ্ছে সন্ত্রাসী। দেশের পথ দিয়ে ছুটে চলতে থাকে ট্রাক, কাকে কখন কেনো কোথায় ধরবে তার ঠিক নেই।

আমরা কি জানতে চাইতে পারি এতে ক-শো কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে জনগণের? টাকাগুলো ব্যয় হয়েছে সন্ত্রাস দমনের নামে সন্ত্রাসে; কয়েক দিনের মধ্যে সেনাসদস্যদের সন্ত্রাসের সংবাদ ছড়িয়ে প'ড়ে দেশকে এবং বিশ্বকে আতঙ্কিত ক'রে তোলে।

মানবাধিকার লংঘনের এটি এক বিভীষিকাপূর্ণ উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সরকার বোঝে নি যে ঝটিকা আক্রমণে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়, বা বুঝেই এ-পথ বেছে নিয়েছে; জনগণকে তারা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে তারা বিএনপি (+জামাত), তারা মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের যৌথ সরকার; তাই তারা পীড়নে অকুতোভয়। তবে সন্ত্রাসীরা হঠাৎ একবারের জন্যে ফুটে ওঠা রক্তকরবী নয় যে সেনাবাহিনী তাদের গাছ থেকে ছিঁড়ে আনবে, আর কখনো ওই রক্তকরবী ফুটবে না।

সন্ত্রাস তো দমন হয় নি-ই, বরং কলঙ্কিত হয়েছে সশস্ত্রবাহিনী।

প্রক্রিয়াটির নাম ছিলো *অপারেশন ক্লিন হার্ট*, কিন্তু এটির জনপ্রিয় নাম

হয়ে উঠেছে 'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ প্রক্রিয়া'। সেনাসদস্যদের হিংস্রতার ফলে তারা শুধু জনপ্রিয়তা হারায় নি, তারা হয়ে উঠছে সন্ত্রাসের প্রতিমূর্তি, এবং পরিহাসের বস্তু। তাদের হাতে ধরা পড়লেই লোকজনের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে, অন্তত ৫৮জন মারা গেছে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে; এবং বিকলাঙ্গ হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। জনগণ অসহায় ও নির্বোধ; সরাসরি না পারলে তারা পরিহাস দিয়েই আঘাত করে শত্রুকে। হাস্যকর হওয়ার থেকে অপমানকর আর কিছু নেই।

বিএনপি (+জামাত) সশস্ত্রবাহিনীর হিংস্র ভাবমূর্তি তৈরি করেছে– সামরিক শাসনের সময়ও তারা এমন হিংস্র রূপ নেয় নি,– এবং তাদের ক'রে তুলেছে উপহাসের পাত্র।

সরকারমুখি *সাপ্তাহিক ২০০০* (৩ জানুয়ারি ২০০৩)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রথম দিনেই তারা ঢাকায় আটক করে ৩০০জনকে, এবং সারাদেশে ১৩৬৫জনকে।

২৯ ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা অভিযান চালায় ৫০,২৫৮টি। এতো অভিযানে একটি দেশ জয় করা যায়, কিন্তু আমাদের বাহিনী ৫৮ জনের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ও কয়েক হাজারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভেঙেচুরে দেয়ার বেশি কিছু করতে পারে নি। কিন্তু তাদের হিংস্রতা কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে।

তারা আড়াই মাসে গ্রেফতার করে ১০,৪৯০জনকে : এদের কিছু দাগি সন্ত্রাসী, কিছু সরকারি দলের এবং অধিকাংশই আওয়ামি লিগের নেতা। এর ভেতরে হয়তো বাঙলাদেশের ভবিষ্যতের জন্যে দুর্যোগের বীজও বোনা হয়েছে; বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদনে বারবার জানানো হয়েছে জামাতের সন্ত্রাসীদের ধরা হয় নি, ধরা হয়েছে বিএনপি ও আওয়ামি লিগের সন্ত্রাসীদের; অথচ দীক্ষিত সন্ত্রাসীরা আছে জামাতেই।

সেনাবাহিনী অপকর্মও অনেক করেছে: মেয়েদের ঘোমটা না দেয়ার জন্যে শাস্তি দিয়েছে (ঘোমটা না দেয়া কি সন্ত্রাস?), পানিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, মানুষকে কান মলিয়েছে রোজার মাসে সিগারেট খাওয়ার জন্যে (এরা কি মৌলবাদ প্রচারে নেমেছিলো?), তাদের সামনে দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে গেলে কান ধ'রে ওঠ-বস করিয়েছে (মোটর সাইকেল চালানো কি সন্ত্রাস?); অনেককে পা-ফাঁক ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যদিও তারা কোনো অপরাধ করে নি। এটা মৌলিক মানবাধিকারের চরম লংঘন। ক্ষমতা পেয়ে *জওয়ান*রা (শব্দটি পাকিস্তানি) অপমানকর শাস্তি দিয়েছে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে, যাদের বাড়িতে সাধারণ অবস্থায় তারা ঢুকতেও পারতো না, বা ঢুকতে পারলে ধন্য বোধ করতো।

মানুষকে খুন করার অধিকার কারো নেই, ক্ষমতার জোরে অপমান

করার অধিকারও নেই। সন্ত্রাস দমনের নামে তারা সন্ত্রাস করেছে। জনগণকে তারা অপমান করেছে, আর প্রচণ্ড পীড়ন তো করেছেই। বারবার মনে হয়েছে এ-কোন অসভ্য জংলি বর্বর দেশে বাস করছি আমরা? আমরা কি এই বর্বর জংলি বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

সেনারক্ষণে মারা গেছে ৫৮ জনের মতো। কীভাবে মারা গেছে? হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ না হ'লে, বিজ্ঞানের মতে, কেউ মরে না; মৃত্যু মানেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া। *অপারেশন ক্লিন হার্ট*-এর নিয়ন্ত্রকেরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো বিশুদ্ধ ধার্মিক নয়;– হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৫৮জন মারা গেছে, এটা বলা ঠিক হয় নি, তাদের বলা উচিত ছিলো– 'আল্লার মাল আল্লায় নিয়ে গেছে'।

তাহলে আমরা শান্তি পেতাম। সেনাবাহিনী কি তাহলে যথেষ্ট পরিমাণে ধার্মিক নয়? তারা কি জানে না হায়াত-মৌত কার হাতে? পঙ্গু হয়েছে ক-হাজার? তার কোনো হিশেব নেই।

শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের বিচারের উর্ধ্বে রাখার জন্যে ১৯৭৫ সালে খন্দকার মোশতাক জারি করেছিলো বাঙলাদেশের প্রথম 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ', আবার ২০০৩-এর ৯ জানুয়ারি বিএনপি (+জামাত) সরকার জারি করেছে দ্বিতীয় 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ'। এ-অধ্যাদেশের একটি ধারায় বেশ বিমূর্ত আইনের ভাষায় বলা হয়েছে :

> ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখ হইতে ৯ জানুয়ারি, ২০০৩ তারিখ কার্যদিবস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখে প্রদত্ত আদেশ এবং তৎপরবর্তী সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ, উক্ত আদেশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কৃত যাবতীয় কার্য এবং উক্ত আদেশসমূহ বলে ও অনুসারে যৌথ অভিযানের জন্য কোন সদস্য বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার দায়িত্ব বিবেচনায় প্রদত্ত আদেশ, কৃত আটক, গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদসহ সকল প্রকার কার্য ও গৃহীত ব্যবস্থা, প্রচলিত আইনে ও আদেশসমূহে যাহাই থাকুক না কেন, ১৬ অক্টোবর, ২০০২ তারিখ প্রদত্ত আদেশ প্রদানকারী এবং কার্য সম্পাদনকারী এবং যৌথ অভিযানে নিয়োজিত শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণকে তজ্জন্য সর্বপ্রকার দায়মুক্ত করা হইল।

এ-অধ্যাদেশ সম্পূর্ণরূপে জনগণের মৌলিক অধিকারের বিরোধী। এ-অধ্যাদেশ বাঙলাদেশের মানুষকে কীটপতঙ্গে পরিণত করেছে, তবে সরকার কীটপতঙ্গকেও, যেমন ফিল্ড মার্শাল মশককে, এভাবে মারতে পারে নি; 'পশু' নয়, 'কীটপতঙ্গ'– আজকের বিশ্বে পশুহত্যাকরীরাও শাস্তি পায়, আমাদের দেশে নরহত্যাকারীরাও 'দায়মুক্ত'।

এ-সময়ে বাঙলাদেশবাসীদের কোনো মৌলিক অধিকার ছিলো না। অভিযানকারীরা (অধ্যাদেশে 'যৌথ অভিযান' বলা হ'লেও অভিযান চালায় সশস্ত্রবাহিনী, পুলিশ শুধু তাদের হাত থেকে 'হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ'দের ও

বিকলাঙ্গদের গ্রহণ ও গ্রেফতার করে, সশস্ত্রবাহিনীর 'শৃঙ্খলা' বিধানের অধিকার থাকলেও গ্রেফতারের অধিকার নেই) যখন তাদের 'শৃঙ্খলা' রক্ষার অভিযান চালাচ্ছিলো তখন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ভ'রে উঠেছিলো আক্রান্তদের আত্মীয়স্বজনের হাহাকারের বিবরণে ও চিত্রে। প্রতিটি ভোর আমাদের জন্যে ছেপে নিয়ে আসতো বিভীষিকার ছবি, বিলাপের বিবরণ। কেউ যদি মানুষের বিলাপ ও বিধ্বস্ততার মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে ও পড়তে চান, তাহলে তিনি এ-সময়ের পত্রিকাগুলো প'ড়ে দেখতে পারেন। এ-অভিযান স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৭১কে, পার্থক্য শুধু এই যে তখন এসব দৃশ্য ছাপা যেতো না, বিবরণ প্রকাশ পেতো না।

তাও ভালো ছিলো; অদৃশ্য অশ্রুত মৃত্যু সুদৃশ্য শিল্পিতভাবে মুদ্রিত, বিলাপভারাতুর, মৃত্যুর থেকে অনেক বেশি সহনীয়। পশ্চিমে এখন মৃত্যুর সংবাদ জানাই যায় না; কিন্তু পুবে, বিশেষ ক'রে আমাদের মতো দেশে, মৃত্যুই এখন প্রধান ও বিনোদনজাগানো সংবাদ।

'হৃদয় শুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া'য় অপমৃত্যুর অজস্র বিবরণ ছাপা হয়েছে পত্রপত্রিকায়, তাতে বাঙলাদেশের স্পর্শকাতরতাহীন মানুষেরাও কেঁপে কেঁপে উঠেছে, তারাও মানবিক হয়ে উঠেছে।

বিবরণগুলো আমাদের প্রভূত সংবাদ ও ধর্ষসুখ যুগিয়েছে, এর থেকে সুপাঠ্য সংবাদ ও প্রাতঃকালীন সুখ আমরা আর কোথায় পেতে পারতাম? সরকার যে এগুলো ছাপতে দিয়েছে, তার কারণ হয়তো তারাও এসব ছবি দেখে ও বিবরণ প'ড়ে বিষাদগ্রস্ত ব্যর্থ বিফল রাত্রির পর প্রভাতে সুখে ভ'রে উঠেছে।

তাদেরও সুখ কোথায়? তাদেরও তো দিনগুলো ব্যর্থতায় বিবর্ণ, রাতগুলো বিফলতায় আতুর।

দু-একটি বিবরণ উল্লেখ করতে পারি।

১৬ অক্টোবর ২০০২, স্থান উত্তরা, সময় রাত্রি, পাত্র বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইয়াকুব আলি। পাত্র সামান্য পুরুষ নয়, সে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক।

মোঃ ইয়াকুব আলি রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলো না; বরং অনেক হংসবধের সঙ্গে হয়তো জড়িত ছিলো। সে নেতা, অন্য কোনো দলের নয়, একেবারে শাসকদলের– আগে অন্য কোন কোন দলে ছিলো সে-সংবাদ আমরা জানি না, হয়তো ছিলো। আমরা ধারণা করতে পারি বিভিন্ন দলে পরিশুদ্ধ হ'তে হ'তে সে বিএনপিতে এসে বিশুদ্ধতা লাভ করেছিলো।

রাত ৩টায় হৃদয় শুদ্ধীকরণ দলের লোকেরা তার বাসায় গিয়ে তাকে ধ'রে নিয়ে যায়। হিটলারের গেস্টাপোদের বা ১৯৭১-এর আল বদরদের এবং আরো অনেকের কথা আমাদের মনে পড়ে। আমরা যুক্তি ও

ইতিহাসের সাহায্যে বুঝতে পারি এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটে নি বিশ্বে; আগেও এমন ঘটেছে, পরেও ঘটবে।

শুদ্ধীকরণ দলের লোকেরা তাকে কোথায় নিয়ে যায়?

ক্যান্টনমেন্টে। চরম চিকিৎসালয়ে। সৌরলোকের কেন্দ্রস্থলে।

ইয়াকুব আলির স্ত্রী জানিয়েছেন ১৬ অক্টোবর গভীর রাতে সেনাসদস্যরা তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে ধ'রে নিয়ে যায়, তারপর তিনি তাঁর শক্তিশালী স্বামীর আর কোনো সংবাদ পান নি। স্বামীর মৃত্যু হয়তো মাঝেমাঝেই তিনি কামনা করতেন– বঙ্গে কে কামনা করে না?, কিন্তু এভাবে তিনি বিধবা হ'তে চান নি ব'লেই আমাদের মনে হয়। তবে রাষ্ট্র তুচ্ছ এক নারীর চাওয়ার না-চাওয়ার ওপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; তাকে আরো শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হয়।

১৮ অক্টোবর তিনি জানতে পারেন মোঃ ইয়াকুব আর নেই। কেনো নেই একদা প্রতাপশালী মোঃ ইয়াকুব? তার কারণ সে-ই দেশে সবচেয়ে শক্তিশালী নয়, তার থেকেও শক্তিশালীরা আছে দেশে। ইয়াকুব মারা গেছে। ইয়াকুবের হয়তো হৃদরোগ ছিলো, যা সে নিজেও জানতে পারে নি; সেটা ধরা পড়ে সেনাসদস্যদের হাতে ধরা পড়ার পর।

ইয়াকুব হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।

ইয়াকুবকে কি পীড়ন করা হয়েছিলো? পীড়ন কাকে বলে? বাঙলা ভাষায় কোনো শব্দই আর ঠিক অর্থ প্রকাশ করে না। তাকে দলাইমলাই করা হয়েছিলো? ওটা তো খারাপ জিনিশ নয়, পশ্চিমে ফিজিওথেরাপি এখন জরুরি চিকিৎসা ব'লে গণ্য; তার চিকিৎসা করা হয়েছিলো; ফিজিওচিকিৎসা, তাতেই মোঃ ইয়াকুব মারা যায়।

চিকিৎসকদের হাতে মৃত্যু হ'লে অভিযোগ করা যায় না।

চিকিৎসকদের দায়মুক্তির সার্টিফিকেট রয়েছে।

ইয়াকুব কি সন্ত্রাসী ছিলো? অবশ্যই ছিলো। ক্ষমতাসীন দলের অতো বড়ো একটি পদে থাকতে হ'লে সন্ত্রাস করতেই হয়। সন্ত্রাস না ক'রে কে নেতা হ'তে পারে বাঙলাদেশে?

ইয়াকুবের ওপর যে-চিকিৎসা চালানো হয়েছিলো, তার কারণ কী? সে সন্ত্রাসী ছিলো ব'লে? না, অন্য কোনো কারণে?

ইয়াকুবের স্ত্রী জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তার ভাইয়ের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ ছিলো ইয়াকুবের, এরই ফলে ঘটেছে চরম চিকিৎসা। চিকিৎসার আধিক্যে হৃদরোগে মারা গেছে মোঃ ইয়াকুব।

হৃদয় শুদ্ধীকরণ অভিযান একটি তথ্য উদ্ঘাটন করেছে যে বাঙলাদেশে হৃদরোগীর সংখ্যা বিপুল।

ইয়াকুবের হৃদযন্ত্র বিকল ক'রে দমন করা হয়েছে একটি সন্ত্রাস, ইয়াকুব ভবিষ্যতে আর সন্ত্রাস করবে না; বাঙলাদেশ সন্ত্রাসমুক্ত থাকবে। বেগম ইয়াকুব একটি মামলাও করেছেন; তবে তিনি হয়তো জানেন না তাঁর স্বামীর চিকিৎসকেরা 'দায়মুক্ত'।

আরেকজন হৃদরোগীর নাম আফজাল হোসন।

আগে তার হৃদরোগ ধরা পড়ে নি, সেনাসদস্যরা সেটা ধরেছে। তার অনেক আগেই একজন হৃদরোগবিশেষজ্ঞের সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিলো।

তার বয়স ৩০, পিতা চান মিয়া। সে সাভারে একটি মোরগমুরগীর খামার চালাতো। পরিবেশ নষ্ট করতো; চারদিকে গন্ধ ছড়াতো। সে অরক্ষিত ছিলো; তবে ২১ অক্টোবর রাতে সাভারে সেনাসদস্যদের সংরক্ষণে থাকা অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে মারা যায়।

'মারা যায়' বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, সত্য হচ্ছে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। হৃদযন্ত্র একটি বাজে যন্ত্র, যখন তখন নষ্ট হয়; এটা বাদ দিয়ে আমাদের একটি ভালো যন্ত্র কিনতে হবে।

২১ অক্টোবর দুপুরে সে একটি দোকানে ব'সে খাচ্ছিলো, দোকানে ব'সে খাওয়া অস্বাস্থ্যকর ব'লে সেনাসদস্যরা তাকে নিজেদের স্বাস্থ্যকর সংরক্ষণে নিয়ে যায়। একটি প্লাজার সামনে নিয়ে সেনাসদস্যরা তার দেহকে বিচিত্র রকমের শিক্ষা দেয়– বানায়; দেড় ঘণ্টা পাঠদানের, বানানোর, পর তাকে নেয়া হয় তার বাড়ির সামনে।

সেখানে তাকে একটি পুকুরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে অস্ত্র তুলে আনতে বলা হয়। পুকুর থেকে মাছ ধ'রে আনতে বললে হয়তো সে দু-একটি ট্যাংরা পুঁটি ভ্যাদা ধ'রে আনতে পারতো; সে কিছুই পারে না, তবু দয়ালু সেনাবাহিনী তাকে গাড়িতে ক'রে নিয়ে যায়; হলিউডি বা হিন্দি সিনেমার মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তায় ফেলে গাড়ি দিয়ে টেনে নেয় নি। তারা তাকে গাড়িতে ক'রে নিয়ে যায়।

সেনাসংরক্ষণে থাকার সময় তার গোলমাল ঘটে।

তখন ভার বহনের দায়িত্ব পড়ে সাভার থানার ভা(রপ্রাপ্ত)-ক(র্মকর্তা)র ওপর; ২১ অক্টোবর গভীর রাতে সাভার থানার ভা-ক আফজালের মৃতদেহ সেনানিবাস থেকে থানায় নিয়ে আসে।

আফজাল কি মারা গেছে?

না; সেনাবাহিনীর এক হাবিলদার একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে যে 'হার্ট অ্যাটাক'-এ মরণ বরণ করেছে আফজাল। কিন্তু তার পরিবারবর্গ বলেছে, সে মারা গেছে সেনাবাহিনীর নির্যাতনে।

নির্যাতন আমরা করতে পারি, কিন্তু তার ফলে যার হৃদরোগ হয় সে

সন্ত্রাসী, সে নষ্ট করে দেশের ভাবমূর্তি।

এভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় আরো অনেকের, একটি একটি ক'রে অন্তত ৫৮জনের, এবং পঙ্গু হয় কয়েক হাজার।

এভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে আমিরুল হক (ভোলা) জাহাঙ্গির হোসেন (বাউনিয়া বাঁধ), শফিকুল ইসলাম (শেরপুর), রতন মোল্লা (কাশিয়ানি), সাইফুজ্জামান (সাদুল্লাপুর), আজিজ সরদার (পাংশা), নাজমুল ইসলাম (রাজপাড়া), জুলহাস বেপারি (শ্রীনগর), আঃ ওয়াদুদ (রামগতি), তোতা খান (মাদারীপুর)....

অভিযানে সরকারও হয়তো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। মন্ত্রীরাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো, তাদের নিজস্ব সন্ত্রাসী প্রচুর, সন্ত্রাসী ছাড়া তাদের ভবিষ্যৎ কোথায়; তবে হাহাকার করেছে বাঙলাদেশ। অভিযানে কোনো কাজ হয় নি; সন্ত্রাসীদের কাজ সন্ত্রাসীরা করেছে, খুন করেছে, ছিনতাই করেছে, ধর্ষণ করেছে, ময়মনসিংহে একযোগে বিভিন্ন ছবিঘরে বোমা ফাটিয়েছে।

তখন আমরা কবলিত ছিলাম সামরিক ও সুশীল সন্ত্রাসীদের দ্বারা।

ওপরে উদ্ধৃত অধ্যাদেশের ধারাটি বেশ বিমূর্ত ও রক্তের দাগহীন।

সরকার বুঝেছে এতে কাজ হবে না, তাই তারা স্পষ্ট ক'রেই রক্তপাত ও নানা বিভীষিকার উল্লেখ ক'রে অভিযানের বীরদের মুক্ত ক'রে দিয়েছে সব দায় থেকে; কিন্তু রক্তের দাগ আরো লাল হয়ে উঠেছে।

অধ্যাদেশের আরেকটি ধারায় বলা হয়েছে :

> উল্লেখিত ১৬ই অক্টোবর, ২০০২ তারিখে প্রদত্ত আদেশ বা তৎপরবর্তী সময়ে প্রদত্ত আদেশ বা কার্যের দ্বারা কাহারও প্রাণহানি ঘটিলে, কাহারও জান বা মালের কোন ক্ষতি হইলে বা কাহারও কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হইলে বা কেহ আর্থিক, শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা কেহ অন্য কোনভাবে সংক্ষুব্ধ হইলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট সকল আদেশ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে বা কার্যনির্বাহীর বিরুদ্ধে বা উক্ত দফায় উল্লেখিত কোন সদস্য বা ব্যক্তি বা শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যগণের বিরুদ্ধে বা তাহাদিগকে আদেশ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে বা উক্ত বাহিনীর কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে... কোন আদালতে কোন প্রকার দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমা বা কার্যধারা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা চলিবে না বা তৎসম্পর্কে কোন আদালতের নিকট কোন অভিযোগ বা প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না... এই ধরনের কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারার বা প্রশ্নের ভিত্তিতে কোন রায়, আদেশ বা সিদ্ধান্ত দেওয়া হইলে তাহা বাতিল, অকার্যকর হইবে বা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মানুষের মৌলিক অধিকার এমন শোচনীয়ভাবে একুশ শতকে আর কে হরণ করতে পারে বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক বিএনপি (+জামাত) সরকার ছাড়া? আমাদের চমৎকার গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে বিশ্বও আহত হয়েছে; এবং বাঙলাদেশের ভাবমূর্তি, যা নিয়ে সরকার খুবই উদ্বিগ্ন, সেটির মুখমণ্ডল এমন কালিতে ঢেকেছে, যা কখনো মোছা যাবে না। এখনো আবার ভয়

দেখানো হচ্ছে দরকার হ'লে আরো তীব্র খিলজিদের লাগানো হবে।

গণতান্ত্রিক বিএনপি (+জামাত) সরকার আমাদের কী দিয়েছে?

একটি জনপ্রিয়, একদা বর্তমান সরকারমুখি, সাপ্তাহিক- *সাপ্তাহিক ২০০০* (১১ অক্টোবর ২০০২)- জোট সরকারের এক বছরের কার্যক্রমের একটি পরীক্ষা নিয়েছে- প্রতিটি পরীক্ষা ১০০ নম্বরের, পাশের নম্বর ৩৩; ওই পরীক্ষায় শোচনীয়ভাবে ফেল করেছে জোট সরকার। সরকার সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে পেয়েছে ১৫; ভিআইপি সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ৬০; দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ০০; বিরোধী দলের ওপর নির্যাতনে ১০০; দুর্নীতি দমনে ০০; প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণে ৩৩; কথামালার রাজনীতিতে ৮০; পরিবহণ ব্যবস্থায় ৫০; পরিবেশ দূষণ রোধে ৮০; নগর উন্নয়নে ০০।

এতেই বোঝা যায় কী অসামান্য বাঙলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে এক বছরে।

তিন দশকেরও বেশি সময়ে আমরা এমন এক বাঙলাদেশ সৃষ্টি করেছি, যা বসবাসযোগ্য নয়, যা একটি নর্দমায় পরিণত হয়েছে।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা ছাড়া আমরা আর কিছুই অর্জন করি নি।

রাষ্ট্রের স্থপতি দেশকে সুপথে নেন নি; তিনি গণতন্ত্র বর্জন ক'রে এগিয়ে গিয়েছিলেন মহাএকনায়কতন্ত্রের দিকে।

উগ্র সাম্যবাদী বিপ্লবীরা শ্রেণীসংগ্রামের নামে খুনের পর খুন ক'রে দেশকে এগিয়ে দিয়েছে বিপর্যয়ের দিকে।

রাষ্ট্রের স্থপতিকে সপরিবারে খুন করা হয়েছে বাঙলাদেশে; বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধ এমন নৃশংসতা আর দেখে নি।

তারপর এসেছে সামরিক একনায়কেরা, তারা নষ্টভ্রষ্ট করেছে দেশকে।

তারা রাজাকারদের মুক্তিযোদ্ধা ক'রে তুলেছে, আর মুক্তিযোদ্ধারা দীক্ষা নিয়েছে রাজাকারদের কাছে।

আমাদের বিচারপতিরা কথা রাখে নি; তারা সামরিক একনায়কদের পরিচারক হয়ে কাজ করেছে।

খুনের ধারা থামে নি, আমাদের এক সামরিক একনায়ক নিহত হয়েছেন তাঁরই প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে।

তারপর এসেছে আরেক সামরিক একনায়ক।

আমরা সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর আন্দোলন করেছি, রক্ত দিয়েছি; তারপর মনে হয়েছে এই বুঝি গণতন্ত্র পেলাম।

বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে, গণতন্ত্র আসে নি।

আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় এসেছে, গণতন্ত্র আসে নি।

বিএনপি (+জামাত) ক্ষমতায় এসেছে, গণতন্ত্র আসে নি।

আমাদের রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, দারোগাপুলিশ

সবাই মিলে দেশটিকে লুঠ ক'রে চলছে।

আমরা দেশ জুড়ে প্রতিক্রিয়াশীলতা বিস্তার ক'রে চলছি, দেশ থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা দূর করেছি। আমরা তরুণতরুণীদের প্রতিক্রিয়াশীল ক'রে তুলেছি, তারা আর প্রশ্ন করে না।

আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছি; আমাদের বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদালয় পর্যন্ত জ্ঞানের চর্চা নেই।

আমরা দেশে কোটি কোটি কর্মহীন তরুণতরুণী উৎপাদন করেছি; আমরা তাদের শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করি নি।

আমরা আমাদের একদল তরুণকে বিদেশে শ্রমিক হিশেবে পাঠাতে মেতে উঠেছি; আমরা হয়ে উঠছি বিশ্বকামলার জাতি।

আমরা তরুণদের ছিনতাইকারীতে পরিণত করেছি।

আমরা ব্যাংক থেকে ৩২,০০০ কোটি টাকা নিয়ে শিল্পপতি, গৃহপতি হয়েছি, জনগণের টাকা নির্বিচারে ছিনতাই ক'রে চলছি।

আমরা শিল্পসাহিত্যকে নষ্ট করেছি; লেখক-বুদ্ধিজীবীরা বিভিন্ন রাজনীতিক দলের দালাল, পেছনের সারির কর্মী, এমনকি গুণ্ডা হয়ে উঠেছে।

আমরা রাষ্ট্রধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছি, আর নিরন্তর ঘুষ খাওয়াকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করেছি।

ধর্ম দিয়ে আমরা সরল মানুষদের প্রতারণা ক'রে চলছি; আমাদের রাজনীতিবিদেরা হজ-ওমরাকে রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে পরিণত করেছে।

আমরা জনগণকে কোনো অধিকার দিই নি।

তাদের জীবিকার, শিক্ষার, চিকিৎসার ব্যবস্থা করি নি।

গণতন্ত্রের নামে আমরা স্বৈরাচার চালিয়ে যাচ্ছি।

দুর্নীতিতে আমরা বারবার প্রথম স্থান অধিকার করছি।

এই আমাদের বাঙলাদেশ, এই আমাদের সোনার বাঙলা।

কিন্তু আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?

এমন দুঃস্থ, দুর্নীতিকবলিত, মানুষের অধিকারহীন, পঙ্কিল, বিপদসঙ্কুল, সন্ত্রাসীশাসিত, অতীতমুখি, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্মান্ধ, সৃষ্টিশীলতাহীন, বর্বর, স্বৈরাচারী বাঙলাদেশ, যেখানে প্রতিমুহূর্তে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়?

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com